কানাকড়ি

পঁচিশ বছর
(১৯৮৭ - ২০১২)

কবিতার ক্রোড় পত্র
৯০ এবং শুণ্য দশক - ঢাকা, বাংলাদেশ

বর্ষ পঁচিশ((কলকাতা পুস্তক মেলা ২০১২)

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না।
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।)
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
ওহে 'হারাই হারাই' সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।
(আশ না মিটিতে হারাইয়া - পলক না পড়িতে হারাইয়া -
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে।)
কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে -
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয় রাখিতে।
(আমার সাধ্য কিবা তোমারে -
দয়া না করিলে কে পারে -
তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে।)
আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ -
ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় - বাসনা বিসর্জন।
(দিব শ্রীচরণে বিষয় - দিব অকাতরে বিষয় -
দিব তোমার লাগি বিষয় - বাসনা বিসর্জন।)

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

KANAKODI=R.NO.70735/99 ৩৯ আদি গঙ্গা কো-অপারেটিভ রোড,
কলকাতা - ৭০ থেকে প্রকাশিত এবং প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ৮, নরসিং লেন,
কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক - বিশাল ভদ্র।
e-mail : sudhinkolkata@gmail.com / Ph. 9831164227
Book Fair 2012, ₹ 10 only

সূচিপত্র

কবিতা

সুনির্মল কুন্ডু , সন্তোষ মুখোপাধ্যায় , দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
সেখ রমজান, জুবিন ঘোষ, মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বজিৎ রায়, হেমন্তকুমার বৈরাগী, অনুপম মুখোপাধ্যায়
মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

গল্প

মুর্শিদ এ এম
শুভদীপ মৈত্র

স্মরণ

প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

ক্রোড়পত্র (কবিতা)

৯০ এবং শূন্য দশক, ঢাকা (বাংলাদেশ)
প্রবন্ধ : তপন বাগচী - সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণের দুই দশকের কবিতা

<u>২৫ বছরে পত্রিকার কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যা</u>

১. একশোবছরের নারীদের কবিতা
২. গল্প সংখ্যা(১)
৩. প্রবন্ধ সংখ্যা(২)
৪. যুদ্ধ বিরোধী সংখ্যা
৫. সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংখ্যা
৬. কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সংখ্যা
৭. জেলা ভিত্তিক কবিতার ক্রোড়পত্র
(এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে - হুগলি, মুর্শিদাবাদ, উত্তরপূর্বঞ্চল, দিল্লি ও গাজিয়াবাদ, সদ্য প্রকাশিত ৯০ এবং ০০ দশকের কবিতা, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সবার জন্য২৫-এর শুভেচ্ছা

সম্পাদকীয়
কানাকড়ির ২৫ বছর এবং একটি মেহগনী গাছ

১৯৮৭ থেকে ২০১২ কানাকড়ির ২৫ বছর। আসলে ২৮ বছর। বয়স তিন বছর কমানো।

তখনো তার গায়ে ছাপাখানার গন্ধ লাগেনি। বালিগঞ্জে একডালিযা মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, ব্রীজের নীচে কয়েকজন টাইপ মেশিন নিয়ে কাজ করতেন। মনোরঞ্জন দাস ছিল তাদের মধ্যে একজন। সে বাংলা টাইপ করত। তাকে গিয়ে বলতে, রাজি হয়ে গেল। স্টেনসিল পেপারে সে পত্রিকা টাইপ করে দিত। সাহিত্যের প্রতি তার নিজেরও একটা ঝোঁক ছিল। ফলে পত্রিকার কাজ যখন নিয়ে যেতাম, সে খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজটা করে দিত। এবং মজুরি নিতে চাইত না। মিষ্টি খাবার নাম করে জোর করে কিছু দিতাম। এভাবেই তিন বছর কেটে ছিল। চুরাশি, পঁচাশি, ছিয়াসি। সেদিনের সেই কুঁড়িপত্রিকায় অনেকেই লিখছেন। কারো কারো নাম মনে পড়ছে, শ্রুতি আন্দোলনের অন্যতম কবি সুকুমার ঘোষ,অনুবাদক অমিয় রায়চৌধুরী, স্প্যানিশ ভাষাবিদ তরুণ ঘটক, প্রাবন্ধিক সাগর বিশ্বাস, গল্পকার অশোক বিশ্বাস, কবি সোমক দাস, নাট্যকর্মী শুভ জোয়ারদার,অনুপ ঘোষ, নাট্যকার কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্টবক্তা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাষাবিদ নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরাজি, বাংলা এবং হিন্দি ভাষার জীবন্ত সমার্থশব্দকোষ আরতি চক্রবর্তী- দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অনুজ শান্তনু , তাপস প্রমুখ।

এই সময় মনোরঞ্জন পরীক্ষায় পাশ করে রাজ্য সরকারি চাকরি পেয়ে যায়, নব-মহাকরণে তার পোস্টিং হয়। প্রথম চাকরি পেয়ে যে কারো মুখভার হয় সেই দেখেছিলাম। বার বার বলেছিল, দাদা একবার শুধু খবর দেবেন, আমি ঠিক সময় এসে কানাকড়ির কাজ করে দেব। পাগল জানতো না তা সম্ভব নয়। আর এদিকে সুকুমার ঘোষ, তরুণ ঘটকদের উৎসাহে, পরামর্শে কানাকড়ির গায়েহলুদ (বা গায়ে ছাপার কালি) হয়ে গেছে। প্রথম কয়েকবার খড়দহে একটি প্রেসে স্বপন ব্যাবস্থা করেছিল, তারপর নিও-প্রিন্টে কয়েক বছর ঘুরে নরসিংহ লেনের প্রজ্ঞা প্রকাশনী।

এই দীর্ঘ ২৫ বছরে অনেক মানুষ সঙ্গে ছিলেন এবং আছেন। মনে পড়ে প্রথম দিকে, বিশিষ্ট কথাকার সমরেশ বসু, দু-লাইনে একটি আন্তরিক শুভেচ্ছা লিখে দিয়েছিলেন। ছিলেনদের মধ্যে অনেকের জন্যই মাঝে মাঝে মন খারাপ লাগে। যেমন সুকুমারদা, মঞ্জুযদা, অমিয়দা, অভিজিৎ, শর্মিলা - এদের সবার সম্পর্কেই আলাদা করে লেখা যায়। পত্রিকার বেড়ে ওঠার স্মৃতি মন্থন।

আর একজনের কথা একটু না লিখলেই নয়। সে শুধু আমাকে নয়, বহুমানুষকে ছায়া দিয়েছে। আশ্রয় দিয়েছে। কিছু মানুষ সংস্কৃতির প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করেছে। তার চারদিকে উঁচু বেদী তৈরি করেছে। তারপর একদিন একদল নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র, তাকে স্থানচ্যুত করল। ক্যাথিড্রাল রোডে হরির চাযের দোকানের সামনে সেই উজ্জ্বল, সবুজ, প্রসারিত দীর্ঘ মেহগনীজীবন আজ আর নেই।

সেই প্রাচীন মেহগনীর জায়গায় কেউ নতুন কোনো মেহগনী-চারা রোপন করেনি। লিটল ম্যাগাজিনের সাহিত্যকর্মীরা কী সেই চারা রোপনের দায়িত্ব নিতে পারে না!

সুনির্মল কুন্ডু / না হল তেমন কিছ

না হল তেমন কিছু, এরকম রণক্ষেত্র পেলে
অস্ত্র রেখে চলে যাবে? সত্যিকার বনধুদের ফেলে
উধাও হলে কি শান্তি? যুদ্ধ- শান্তি দুটি শব্দভার
কোথায় কীভাবে মিলে হতে চায় গাঢ় আকাঙ্ক্ষার
নিরলস সমভূমি - পা বাড়াও হেঁটে যাও, ওহে -
কে মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকে রোদ চোখে প্লাবনের মোহে?
কে মিথ্যে দাঁড়িয়ে দ্যাখে সারারাত বৃষ্টির আঁধার ?
কে মিথ্যে দাঁড়িয়ে শোনে কাঁদে দুঃখে নিশুতি পাহাড়?

না হল তেমন কিছু, মানুষের প্রচীন শহর
ক্রমশ প্রাচীন হয়ে ভাঙচুরে কত অসহায়;
অনেক স্ট্যাচুর স্থান হয়ে ওঠে বাতিল কবর,
অনেক পথের গায়ে নবতর নাম দ্যাখা যায়,
হতে পারে রণক্ষেত্রে আর নয় যুদ্ধ মানুষের -
হেঁটে যাবে মানুষেরা গল্প বলে হৃদয়পুরের।

সুনির্মল কুন্ডু /আড্ডা হবে শীতে

আড্ডায় কী সতর্কতা - বলে ফ্যালো - যে জন্য এসেছ,
যথেষ্ট নির্জন শব্দ হাতে নয় - বাক্সে রেখে দিন -
নিজেই নিজের কাছে ধরা পড়ে, একাকী হেসেছ,
আমাদের শোনা চাই যাবে কবে আঁতেল-মিছিলে?
কথা কিন্তু থেকে যায়, তারপরও প্রচারবহুল
রাস্তায় জমেও লোক - লোকদের ইচ্ছে বুঝে নিতে
ধরা যেতে পারে গুরু, যেতে পারে মিলে ভালো স্কুল,
না হলে ভরাট বর্ষা বাদ দেব - আড্ডা হবে শীতে।

আড্ডায় থাকে না ফাঁক, নানাভাবে মতবিনিময় -
কে কাকে উড়িয়ে দেবে ফুঁ-শব্দের অমিতবিক্রম
কার্যকারিতার জেরে? কোনো মেধা মেধাবী উদ্যম
আড্ডার সমগ্র শিল্পে ব্যক্তিগত ঐচ্ছিক বিষয়:
ভেবেচিন্তে আড্ডা হয়? ভেবেচিন্তে জীবনযাপন
নিয়ম মাথায় করে মেনে নেয় লৌকিক শাসন।

সন্তোষ মুখোপাধ্যায় / রহস্য

বাতাস বেরিয়ে পড়েছে হয়তো মাঠে মাঠে - নাকি বনের দিকে!
পথে একা গাছ। একাই তো। দূরে নদী
জটিল বা গূঢ় নয়। খুব সাদাসিধে শুধু

কথাগুলি বাড়িছাড়া। গাছ - ডালপালা ছাড়া।
উড়ে নয় - লাফিয়ে, ধাক্কা দিয়ে ঘাটেপথে
কি যে সোরগোল তার। তখন ধুধু

চারধারে কিছু ভয়ভীতির গল্প তাতে কত দরজা বন্ধ হল।
মানুষজনে পশুপাখি শোবার আগেই তবে ঘুমে মুহ্যমান -
ক'জন যারা কথার সাথে কথা জুড়বে ভেবেছিল, তারা

দ্বিধার ভিতর, অসঙ্গতির ভিতর সহজগল্প হারালো অংশত।
শেষে হঠাৎ-ই যেন কানাচ থেকে নেমে আসে রূপকথা আর
গানের ঝাঁপি। গান গাইলো সবাই। দিনটা কি যে আত্মহারা!

এভাবেই বেরিয়ে পড়া বাতাস হয়তো মাঠে মাঠে -
শেষ অবধি গানের দিকেই গিয়ে জোটে।

ঋত্বিক ঠাকুর / স্মার্ত

কথা ছিল না এখানে আসব।
কাটা ঘুড়ি উড়িয়ে এনেছে।
স্কুল পালানো ছেলের হাতে আপাতত বাঁধা আছি।
আমার ইচ্ছেরা নামতা পড়ছে।
পাশ-ফেল গড়াগড়ি দিচ্ছে বুনো মনসার ঝোপে।
ফাজিল মেঘের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে ঐকিক নিয়মে বাঁধা
অঙ্কের কাগুজে গোলা।
ডুবে যেতে যেতে সূর্য হাসছে। ভাবছে, আগে জানলে
আরও কিছুটা থাকা যেত।

সেখ রমজান / চণ্ডীদাস

তীব্র এক অবাধ্যতার নেশা
ধারালো আর ভীতুর মিশ্র দ্রবণ,
নগ্ন বেলাভূমির গোপন হ্রেষা
জ্যোৎস্নামাখা রোদের তীব্র লোশন।

একটা দুটো রোদের ফটোগ্রাফি
ক্ষতমুখে পাহাড় প্রমাণ নুন,
নোনতা মহাদেশের নিম্ন নাভির
ছায়ার মধ্যে ওড়াই ফুটো বেলুন।

মৃত শহর জাগাই মাঝে মাঝে
উল্টে দেখি কামরাঙা সেই ফসিল,
এখনো সেই বিভাজীকার খাঁজে
শব্দ ভাঙা স্রোতের মধ্যে বসি।

গভীর আরো উল্কিকাটা প্রহর
কোথায় নাম, কোথায় নাম লেখা,
হিম কুয়াশায় ঢাকা একটি গ্রহর
দুপুর ঘাটে রজকিনীর দেখা।

জুবিন ঘোষ / ঠিক ২০৬ দিন পর

প্রতিদিন এস.এম.এস করে আমার অস্তিত্ব রেখে যাবো
রেখে যাবো সার পরিণতি, পাতাপুতো, অনসন, এটাওটা
হাসিঠাট্টা, প্রাত্যহিকী, হাড়গোড়। প্রায় রোজ।
এই হরফগুলোর বিনীত, নিতান্ত বিনীত শব্দ সম্ভার থেকে
টুকটুক করে সংগ্রহ করে তোমাকে উপহার দিতে যাবো
পরপর দুশো ছয় দিন, পারলে ঠিক ও'কটা দিন পর
হিসাব কষে মিলিয়ে নিও আমার পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল।

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় / তিথি বলে ডাকি

(১)
রক্তের ভিতর বেজে ওঠে কার গান
আমরা ভুলে যাই নীল স্বরবর্ণের কম্পন
অন্ধকার থেকে যা পাওয়ার ছিল তাই পেয়েছি
নিশুত রাতির অবয়ব থেকে
কবে যেন একটা মানুষ এঁকেছি
দর্পনে তার প্রতিচ্ছবি
সে সপ্তমী কিনা জানিনা
শুধু তিথি বলে ডাকি।

(২)
তিথির ক্ষণ নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই
ভালো মানুষ নিয়েও নেই
একটা সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারার জন্য আমি না করেছি
যেখানে আকাশ নক্ষত্রের মতো সাদা
আমি তার কাছে ছুটে যাব।

(৩)
মৃত্যুর ডানায় ভর দিয়ে উড়ছি
জন্মকে ছোঁব বলে
আমি কোন কৃষ্ণসাগরের তীরে অমবাবতীর গল্প জানি...
তিথি...

(৪)
চিলের চঞ্চুতে যে রোদ নেমেছিল সে আমার পাপ
কর্ণকুন্তির কথা আজ থাক
আজ শুধু সাদা পৃষ্ঠায় ভুলের এক চতুস্কোণ আবাহন করি।

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ / আলাপ

অনর্গল তোমার উপস্থিতি
খুলে ফেলছে আত্মানুসন্ধানের পরিসর

দুপাশে তার ছায়াটুকু ঘিরে
নীরবতা পাঠিয়ে দিল সৌহার্দ্য প্রস্তাব

শিমূল পলাশ পিয়াল
নানাবিধ কোলাহলে মুখিয়ে রইল
আলাপের ইচ্ছে নিয়ে

আমিও যে আলাপের ইচ্ছে নিয়ে
রোদ্দুর মাখি
কখনও বৃষ্টি
কখনও ফাগুন

উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে থাকে
সাবেক রূপকথামালা...

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় / ঈশ্বরের রোদ

এভাবেই আমি আমার ভুলগুলির ধারাবাহিক
লক্ষ্য করি দূরদর্শনের পর্দায়
আর ইচ্ছাপত্রে লিখেনি আশ্চর্য চেরাগ
জ্বলে উঠি নিভে যাবার আগেই
কুয়াশার ভেতর হেঁটে যায় অলীক ঈশ্বর
আমাকেও কি নিয়ে যাবে?
ছুটতে ছুটতে কখন যে রোদ এসে গেছে...

. **বিশ্বজিৎ রায়** / পোশাক

রাত ভেবে ভুল করেছো
এখন রাতের পাশে থেকে
খুবলে খুবলে খায়, সাধারণ নয়তো
খুব ঘন ছবি আঁকে, একটার পর একটা
চারিদিকে ছড়ানো বোতাম।
কোনো ছিদ্র নেই নিরাপত্তার,
যেভাবে শান্তি ছড়িয়ে পড়ে

ক্ষতচিহ্ন অথবা দুর্ঘটনা নাম নিয়ে...

হেমন্তকুমার বৈরাগী / সবাই চলে যায়

সবাই চলে যায়, একদিন
তুমি - আমি
আমাদের ছায়া
দুষ্কর্মের আয়ুও শেষ হয়
জীবনের সঙ্গে

যে খেলা খেলতে ছেলেবেলায়
কোন সে ময়লার স্তুপে, তাও
ছাই হয়ে গেছে

যৌবন - উদ্দাম - চঞ্চলতা
জাড্য হয়েছে
সময়ান্তরে...

সবকিছুই শেষ হবে
থাকবে না অস্তিত্ব কোনও কিছুর
কারোর - তুমি আমি

আমাদের ভালোবাসা !!

অনুপম মুখোপাধ্যায়

একতারা একতারা ১

একটা বালিশ যেমন হয়
দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসে দেওয়ালের চোখ

চিঠি ছিঁড়ে যাচ্ছে বিছানার কাঁটায়
তোমরা ভাবছো ডানা
তোমরা ভাবছো আমি এখানে ফকির হয়ে আছি
একজন ফকির যেমন হয়

একতারা থেকে খসে পড়ে ঘরের দরজা
যেমন নয়
তেমন নয় এই শোয়া ঠোঁট গুঁজে

একতারা একতারা ২

লালন সাঁইয়ের গান ডাউনলোড করেই
একতারাটা চাপা দিয়ে রাখি

আমার প্রিয় পাখিটার
উন্মাদদশার কারনও আমি জানি
মনে মনে রাখি
খাঁচায় নয়

হিজরি ১৩১৩ সন শ্রাবণ মাসে
যে আমার ফাঁকগুলোকে
ফুসলে নিয়ে ভাগে -
একতারাটা
ভরসা
বলি না

(গল্প)

মুর্শিদ এ এম / যযা

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাথরুমের কল খুলতে গিয়ে পিল্লু দেখে তা থেকে জল ঠিকঠাক পড়ছে না। মানে পড়ছে যথার্থ, অথচ না-পড়ার বেলায় সে গোলমাল পাকাচ্ছে। সেটা সে টের পায় কলটা বন্ধ করার সময়। আসলে যেকোনো কাজ শুরুর বেলায় বোঝা যায় না কতটুকু সম্পন্ন হল; যতক্ষণ না তার শেষ হচ্ছে। পিল্লুর এ বিষয়টা জানা থাকার জন্য খুব একটা অবাক হল না বটে তবে ধন্দ রয়ে গেল এই কারণে যে, কলটা এর আগে এরকম আচরণ করেনি। পিল্লুর কাছে সামান্য কলের না-বন্ধ হওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই সে কলের দিকে মনোযোগ দিল এবং চেষ্টা করল যাতে পুরোপুরি বন্ধ হয়। কিন্তু কলের প্যাঁচ বন্ধ হলেও জল পড়ার বিরাম হল না। জলটা খুব যে ঝিরঝিরিয়ে পড়ে যাচ্ছিল তা নয়, পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা। ঝিরঝিরিয়ে জল পড়লে সর্বনাশ, সারাদিনে কিংবা রাতের কথাই যদি ধরি, তা হলে সমস্ত ঘর জলে একাকার হতে বেশি সময় নেবে না। একবার তার পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশি কদিনের জন্যে বেড়াতে না কী যেন করতে বাইরে গেছিল। যাবার সময় লোডশেডিং ছিল, খেয়াল করেনি; সুইচ-টুইচ বন্ধ না-করে দরজায় তালা লাগিয়ে দিব্যি ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন যা হবার হয়েছে। কিংবা যা হবার নয় তাও। সমস্ত ঘর বাথরুম ডাইনিং জলে জলাকার। তাই সেক্ষেত্রে টুপটাপ জল পড়ার জন্য খুব বেশি ভাবনার নেই। কিন্তু পিল্লু সমস্যায় পড়ে ভিন্ন এক কারণে। এই সময় মনে পড়ে ওর এক বন্ধু গল্প করেছিল, তার কলের কথা। আসলে সারাই মিস্ত্রির কথা; যে নাকি টুপটাপ জলের ফোঁটার ব্যাপারে একেবারেই ইন্টারেস্টেড নয় কেননা যতক্ষণ না জল কলের নল থেকে বেগে পতিত হচ্ছে, ততক্ষণ অব্দি বোঝ সম্ভব নয় যে কলের রোগটা আসলে কী। আর রোগ যদি না ধরা গেল তো চিকিৎসা হয় কী করে? পিল্লু বিষয়টা নিয়ে আবার ভাবার চেষ্টা করে। তার মনে হয় জলের বিষয়টা খবু হেলাফেলার নয়। জল যেখানে জীবনও সেখানে। জলের আরেক নাম জীবন বলেই আয়লার জলোচ্ছ্বাসে বহু জীবন চলে যায়। তার জীবনে; সে ভাবতে থাকে এরপর, জলের অবদান তেমন নেই বললেই চলে। কিন্তু তা না থাক, কল না-সারানোটা কোনো কাজের কথা না। কিংবা জলের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলেও কোনো অজুহাত দেয়া বোকামিরই লক্ষণ। জল যে মূল্যবান বস্তু তা সে ইশকুলেই জেনেছে। পিল্লু পুনরায় বাথরুমের দিকে যায়। ফের সে লক্ষ করে জলের গতিপ্রকৃতির দিকে। তারপর সে জানতে পারে সুদূর হতে আসা এক অদ্ভুত সুর তার কানকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বস্তুত তার শ্রবণেন্দ্রিয় যে এত শক্তিশালী আর স্পর্শকাতর তা জানা ছিল না। টুপটাপ জলের পতিত ফোঁটা থেকে উঠে আসা সেই শব্দ যেন বা পিল্লুর সমস্ত চেতনাকে লুপ্ত করে দেবে মুহূর্তে। আবার কান পেতে সে সমস্ত অজাগরিত ইন্দ্রিয়কে সংহত করে শুনতে চেষ্টা করে জলের শব্দ। এবার সেই সুরের মূর্ছনা খানিকটা যেন চেনা চেনা

লাগে। সে বলতে পারবে না, কোথায় বা কখন সুরের উৎপত্তি, বছরখানেক আগের কোনো ঘটনা, না তার শিশুকালের তা সে বলতে পারবে না, হতে পারে আরেক কোনো জন্মের। এরকম কি হতে পারে, যে-ঘটনা সে টের পাচ্ছে তা এখনো ঘটেনি! কেননা সে এইমাত্র দেখতে পেল ঝিমলিকে, সেই ঝিমলি; যে নাকি তার সঙ্গে বসবাস না করেও দিব্যি সংসারে ওঠাবসা করছে। আর এই মাত্র যে আবছা গোলাপি শাড়িতে ভিজল বলে ভেজার পর শাড়ি থেকে শরীর থেকে বুক থেকে উরু থেকে পা-দুখানি থেকে জল ঝরছে টুপটাপ। পিল্লু জলের ওই শব্দ, না ঠিক শব্দ নয়, কান্নাই হবে জলের, শুনতে পেল তখনই। জলের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমলির কান্না যেন বা মিলেমিশে নতুন এক সংকেত সৃষ্টি করছে। ঝিমলি, যে নাকি জল পেলে আর কিছু চাইত না, সে যে জলে ওভাবে মেলে ধরবে, যাতে ফুটে উঠবে এক যন্ত্রণা তা পিল্লু আগে আঁচ করতে পারেনি। পিল্লুর সঙ্গে ঝিমলির সম্পর্কটা আরেকবার সে ঝালিয়ে নিতে গেলে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারপর তার মনে পড়ে, ইশার কথা। যে জীবন; পিল্লু অনেকবার ভেবেছে তার কি না, সে জীবনে কার অবদান গুরুত্বপূর্ণ, ইশার না ঝিমলির সে বোধটা এখন কিছুতেই মনে করতে পারে না। তাছাড়া জলের সমস্যা এখনো অব্দি না মেটার কারণে পিল্লুর মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া ঠিক না। এমনিতে দিনের মধ্যে ষোলো ঘন্টা কারেন্ট আর আট ঘন্টা লোডশেডিং-এর কারণে ট্যাঙ্ক ভরে না, তার ওপর যদি জল এভাবে পড়তে থাকে, তো সব কাজ কেমন পণ্ড হবার জোগাড় হয়! তাহলে বোধহয় একজন মিস্ত্রিকে ডাকলে ভালো হয় যে খানিক পরামর্শ দিতে পারবে, কিছুক্ষণ থেকে সঙ্গ দেবে, এমনকী কলটা সারিয়েও দিতে পারে টাইমের মধ্যে। কিন্তু সেবার যখন পুজোর সময় তাদের, কিংবা তারই কল সারাই করার জন্য তড়িৎ মিস্ত্রিকে ডাকা হয়েছিল, তখন ঘটনাটা ঘটেছিল অন্যরকম। এর জন্যে তড়িতের নামটাই দায়ী কি না কে জানে, তাকে যতবার ফোনে ডাকা হয়, সে বলে যে, এক্ষুনি এসে পড়বে; অর্থাৎ তড়িৎগতিতে আসবে, কিন্তু হয় ঠিক তার উলেটোটা। তাকে প্রথমদিন দিনে চারবার, দ্বিতীয়দিন দিনে তিনবার, তার পরেরদিন একবার এবং তারপর থেকে রোজ ঘন্টায় ঘন্টায় ফোন করার পর তবে যদি তাকে পাওয়া যায়। তড়িতকে পাবার পর সে সবকিছু খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করার পর বলল, একটা কল যদি সারান তাহলে খরচ পোষাবে না, বরং এক কাজ করুন, আর কিছুদিন যাক, সামনের মাসে একবার কল করবেন, আমার তো জানা রইলই, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসব। মানে, যতদিন না সবকটা কল খারাপ হবে ততদিন তাকে ডাকা যাবে না। কিন্তু আজও সবকটা কল খারাপ না হলে পিল্লুর কী করার আছে সে ভেবে পায় না। কিন্তু জল এমন এক জিনিস, যাকে খুব এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। পিল্লুর হঠাৎ রবিঠাকুরের জীবনের প্রথম মিল দেয়ার দুটি লাইন মনে পড়ে, এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে। পিল্লু জলের সঙ্গে কখনো ক্রীড়া করার কথা ভাবতে পারে না। গ্রামের মেয়েরা কলসি কাঁখে কতদূর থেকে জল নিয়ে আসে, যাকে নিয়ে আসা না বলে সংগ্রহ করা বলা ভালো; এক গাঁ থেকে অন্য গাঁ পেরিয়ে, প্রখর তাপ কিংবা বৃষ্টি-বাদল অগ্রাহ্য করে জীবনের মূল্যবান সময় কিছু নষ্ট করে। তা সত্ত্বেও পথিমধ্যে কেউ যদি ছুঁয়ে দেয়, না, যে কেউ ছুঁয়ে দিলে হবে না; নীচু জাতের কিংবা যাদের জাতকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না, তারা দিলে ওই সমস্ত সংগ্রহ অত দূর থেকে নিয়ে আসা অত সময় নষ্ট করা অত কসরত এবং বিপদ-আপদ পেরিয়ে

জলের হয়ে-ওঠা-জলকে ফেলে দিতে হয়। পিল্লু একবার কখন যেন ভেবেছিল, ঝিমলি যদি ওভাবে জল নিয়ে আসে আর সে যদি তাকে ছুঁয়ে দিত তাহলে কি ঝিমলির জলও প্রকৃত জল হয়ে ওঠা থেকে বিরত থাকত! কিংবা সে-সমস্ত জলকে ঝিমলি কি মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে কোনো কষ্ট পেত না? তবু কতবার যে পিল্লু ঝিমলিকে কলসি কাঁখে জল আনতে দেখে। জল নিয়ে আসার শরীরী সৌন্দর্যের সঙ্গে কেমন যেন বেমানান মনে হয় জলকে মাটিতে ফেলে নষ্ট করার ভঙ্গি। পিল্লু আর এরপর ঝিমলিতে থাকতে পারে না, থাকা সহ্য হয় না, কেননা এরপরই হয়তো যা সে বহুবার ভুলতে চেয়েছে সেটা মনে এসে উঁকি মারবে কিংবা ভুলতে চাওয়াটাই প্রতিপন্ন হবে তার একমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে, সুতরাং সে অলীক সেই দৃশ্যটি থেকে সরে আসা নিরাপদ মনে করে। যে দৃশ্য জলকে ঘিরে, অথবা তাকে ঘিরে সেই অসম্ভব জল, জলকণা অথবা জলধারা কিংবা যে কলটা সে বন্ধ করতে চেয়ে নাকাল হচ্ছে তা থেকে পড়ে যাওয়া পিল্লুর একমুঠো যন্ত্রণা; তাকে কীভাবে সামলায়, অথবা বন্ধ করে দিতে চায় সত্যি সত্যি! আর তখনই তার ফোন বাজে, ওপার থেকে কে যেন কথা কিংবা ভাষ্য ছুঁড়ে দেয়ার অপেক্ষায় অথবা তাকে বিপদে ফেলার ফন্দি আঁটা এক শরীরহীন মানব, আবার মানব নয় হয়তো; পিল্লু ফোন তোলে। অপর প্রান্ত থেকে তড়িতের কণ্ঠ শোনা যায়, হ্যাঁ, তড়িতের ওটা কণ্ঠই, গলা না। পিল্লু চমকে ওঠে, কী যেন বলে, মেঘ না চাইতেই জল, ব্যাপার সেরকম মনে হয় পিল্লুর। পিল্লু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, কী খবর? সময় হবে? আরে সময় হয়েছে বলেই তো বলছি। ওদিক থেকে ভেসে আসে কণ্ঠ। সবকটা কল খারাপ না কি ? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবকটা কল মায় আমার নিজের কল পর্যন্ত বিগড়ে বিকল হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পার চলে এসো তড়িৎদা। তড়িৎকে কল করে কিংবা তার কলের জবাবে ডেকে ডেকে পাঠিয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত মনে হল পিল্লুর। লোকটার হঠাৎ এত ইন্টারেস্ট কেন হল কে জানে। যাই হোক সে যদি আসে তখন না হয় দেখা যাবে, ভাবল সে। তারপর মনে পড়ল, পৃথিবীর বহু মানুষ কল ব্যবহার করে না। সেখানে কলের বদলে কুয়োর আধিক্য। কুয়ো থাকলে একটা সংস্কারকে লালন করা যায় বেশ। ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে বেশ দাপট দেখানো চলে, কিংবা কেউ জল চাইলে তাকে যদি মনে হয় শ্রেণিবহির্ভূত, বা তাকে জল দিলে ক্ষতিবৃদ্ধির আশঙ্কা, কিংবা কোনো পুরোনো প্রতিশোধ যদি নিতে হয়, তাহলে ঘটি থেকে কিংবা ঘড়া থেকে মধ্যাকর্ষণকে মাথায় রেখে মুখ থেকে অনেকটা ওপরে টিপ করে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্তকে চিনচিনে জলের ধারা তার মুখের ওপর ফেলার প্র্যাকটিস করা যেতে পারলে কী যে আনন্দ তা বলে বোঝানো যায় না। তা ছাড়া কুয়ো এমন এক আইকন, এমন তার শৈল্পিক ব্যাপ্তি যা কলের পক্ষে সাপ্লাই দেয়া সম্ভব না। পিল্লুর এরপর মনে পড়ে সেই দৃশ্যটির কথা, যেখানে এক মহিলাকে বিবস্ত্র করে সারা মহল্লা ঘোরানো হয়, তাকে ডাইনি অপবাদ দেবার পর, আর সেই নারীটি ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত হয়ে কুয়োর আড়াল নিতে যায়, যাতে একটু অন্তত জল পাবার সুযোগ সে পায়। কিন্তু কুয়োর আড়াল কেবল উপস্থিত কয়েকশো বিকৃতকাম পুরুষের চক্ষুলজ্জাকে উসকানি দেয়া ছাড়া অন্য কিছু দেয় না। নারীটি এরপর গ্রীষ্মের তাপে তপ্ত বালুরাশিকেই আঁকড়ে ধরতে চায় লজ্জা নিবারণের জন্যে। সে নারীটির সঙ্গে কি ঝিমলির কোনো মিল থাকা সম্ভব! আশ্চর্য হলেও সত্যি, পিল্লু ঠিক এই মুহূর্তে দেখতে পেল, ঝিমলি সরীসৃপের মতো কুঁকড়ে, দুমড়ে, তপ্ত বালুকণার সঙ্গে নিজের শরীর মিশিয়ে দিতে চাইছে। সে কি লাজলজ্জা বাঁচাতে, নাকি পিল্লুর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার

কোনো কৌশল, কে জানে। কিন্তু তাই বা হয় কী করে। ঝিমলির সারা শরীর জলে ভেজা, সে কিচ্ছুক্ষণ আগেও দেখেছে। আর দেখেছে সেই অসম্ভব দৃশ্য, তার শরীরের উত্তল অবতল, যা পিল্লুর একান্তই চেনা আর নিজস্ব; তা ডুবে আছে রক্তে। ঝিমলি যেন রক্তের ধারায় স্নানের আনন্দে মাতাল হয়ে দুলছে, শিহরিত হচ্ছে, আদিম এক শীৎকার বুঝি বেরিয়ে আসছে তার সুরেলা কান্না ভেদ কোরে, আর পড়তে থাকা জলের শব্দে কোনো কান্নার আওয়াজ নেই, আছে সুরেলা সংগীতের ঝংকার। জল যদি ওভাবে বেজে ওঠে, তাহলে বুঝি মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ তৈরি হয়। যেখানে জল নেই সেখানে সংগীত নেই, যেখানে সংগীত নেই সেখানে মানুষ নেই। মঙ্গলগ্রহে তাই সংগীতের বড্ড অভাব। জলের অভাবে সেখানে প্রাণী বাস করতে পারে না। প্রাণ নেই বলেই, সংগীত নেই বলেই, জল নেই বলেই মঙ্গল মানবের নয়, মঙ্গল গবেষণার বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। যা কিছু নেই তাকে নিয়ে গবেষণা চলে নিরন্তর, যেমন পিল্লুর সাথে নেই ঝিমলি, কিংবা ঝিমলির কোনো অন্তিম চিহ্নায়ক বস্তু। কিন্তু গবেষণা দিয়ে কি একজন নারীকে বোঝা যায়? পিল্লু এরপর ক্লান্ত বোধ করলে হঠাৎ মনে হয় কলের জলের পতনের শব্দটা থেমে গেছে, কিংবা সে আর এসব চিন্তা করতে চাইছে না বলেই হয়তো এমন মনে হচ্ছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তবে কি তাকে না জানিয়ে তড়িৎ মিস্তিরি ঘরে ঢুকে গেল! তড়িৎমিস্তিরিরা কি পারে এভাবে যেখানে-সেখানে যখন-তখন কাউকে কিছু না বলে ঢুকে যেতে! তড়িৎ কি আগেও এভাবে তার বর্তমানে কিংবা অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকে গেছিল এবং ঢুকে যাবার পর যা যা করবার তা তা করবার দরুন তার মস্ত বড়ো ক্ষতি হয়ে গেছিল? এক্ষেত্রে ক্ষতি তো তেমন দেখা যাচ্ছে না, কারণ জলপতন বন্ধ হয়ে গেছে মানে কলটা সেরে গেছে। আবার এও তো হতে পারে যে, কোনো অনিবার্য ব্যবস্থায় কলের জল ফুরিয়ে এসেছে, অথচ আগে কোনোদিন সে টের পায়নি। পিল্লুর এসব ভাবনার আগে মনে হয়, কলঘরে গিয়েই দেখা দরকার কী প্রকৃত ঘটছে। বস্তুত কলঘরটাকে এর আগে এত ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়নি ঝিমলি চলে যাবার পর। ঝিমলি বোধহয় চাইত কলঘরে বেশিক্ষণ কাটাতে, শুধু সে নিজে নয়, পিল্লুকে নিয়েই স্নানঘরে এক স্বর্গীয় আবেশ ও পরিবেশ রচনা করার কথা ভাবত বোধহয়। পিল্লু আর দেরি না-করে স্নানঘরের দিকে মনোযোগ দেয়, আর তারপর দরজার হাতলে চাপ দেয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দরজাটা মনে হয় ভেতর থেকে বন্ধ। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে পিল্লু দরজা খুলতে চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই জন্যই কি জলপতনের শব্দ পিল্লুর কানে অস্পষ্ট হয়ে গেছিল? পিল্লু তার এতক্ষণের ভাবনাকে সংহত করে একটাই লক্ষ্যে, যাতে শক্তির অপব্যয় বা অপচয় না হয়, যা দিয়ে সে অন্তত দরজাটা ফাঁক করে হলেও ভেতরের অঘটনগুলো ঠাওর করতে পায়। অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তার মনে পড়ে ঝিমলি যেদিন মনের আনন্দে শরীর ভিজিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিল, সেদিনও এমনই কঠিন হয়েছিল দরজাটা খুলে ফেলা। অতঃপর সে খানিকটা দরজা খুলতে পারলে দেখে তড়িৎ-দা এক অদ্ভুত কায়দায় তার একটি পা দিয়ে কলের মুখ চেপে ধরে তা থেকে জলপতনের ধারা বন্ধ রেখেছে, আর অন্য পায়ের পাতার ওপর পড়ে রয়েছে ঝিমলির লতার মতো উদ্ভিন্নযৌবনা শরীর, এবং তড়িতের আগ্রাসী জিভ চেটে নিচ্ছে লতার শরীরের উথালপাতাল ঢেউ অথবা গহন গভীর অঞ্চল। পিল্লুর চোখ সয়ে আসছিল যতক্ষণ, ততক্ষণ কোনো বিরতি ছিল না তাদের সেই জলসঙ্গমে। কিন্তু পিল্লুর শরীরে অপার্থিব এক ঘৃণা এসে ভিড় করার পর সে দেখল ঝিমলির শরীর ক্রমশ ভিজে যাচ্ছে রক্তে,

আর তড়িৎ তখন তার জিভ থেকে, নখ থেকে, দাঁত থেকে - যা ছিল তার কোমল রমণাঙ্গ; নির্গত হতে দিচ্ছে কঠিন সব ধারাল অস্ত্রের। পিল্লু আর সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেয় কলঘরের কপাট। এরপর চুপচাপ অনেক্ষণ বসে থাকলে পিল্লুর মনে হয় সে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে, আর তাই আবার সে বাথরুমের দিকে যায়। না, সে যাবার চেষ্টা করেও ভাবে কলের জলপতনের শব্দ শোনা গেলে সমস্ত বিষয়টা মিটে যেত। তারপর সে কান পাতে বাথরুমের দেয়ালে আর শুনতে পায় অদ্ভূত এক বাঁশির আওয়াজ। এবার কলঘরের দরজা খুলতে বেগ পেতে হয় না পিল্লুর। সেখান থেকেই আসছে বাঁশির শব্দটা, কলের মুখ থেকে, জলপতনের শব্দ কীভাবে যেন বদলে গেছে সুরেলা মিঠে আওয়াজে, সে সুর জলের আহ্লাদ না জলপতনের কান্না কে জানে।

(গল্প)

শুভদীপ মৈত্র / পাগল ও জননেতা

পাগলটা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন জননেতাকে গালাগাল দিতে শুরু করল। দেশের প্রধান ব্যক্তি, কাণ্ডারি, অসংখ্য নাগরিকের নির্বাচিত প্রিয় মানুষ। পাগলটা ভর সন্ধ্যাবেলা তাকে গালাগাল দিচ্ছে। শহরের দক্ষিণগামী একটি বাসে সে উঠে পড়ে। বাসের যাত্রীরা প্রথমে বোঝেনি। বিড়বিড় করতে করতে পাগলটার গলা যখন পাশেরজন থেকে তার পাশের পাঁচজনের কানে পৌঁছল তখনই শুরু হল উশখুশ অস্বস্তি। অফিসক্লান্ত মানুষ, সিনেমা হল, কফিশপের আমোদ পেটে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা কী করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। নিতান্ত পাগল লোকটায় কিন্তু যাকে গালাগাল দিচ্ছে সে তো আমাদের প্রিয়...। কন্ডাক্টর শেষপর্যন্ত তাকে জোর করে নামিয়ে দিলে সমস্যা মিটল।

পাগলের কিন্তু সেই এক রা - নেতাকে গালাগাল দিয়েই চলেছে। আর কে না জানে আমাদের শহর খুব পরিশীলিত। এখানে আমরা ভদ্রলোকেরা থাকি। তাই পাগলকে নিয়ে কি করা হবে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। এমনিতেই ওর গায়ে জল ঢেলে দেওয়া, ঢিল ছোঁড়া, কখনো বেঁধে রাখা, এসব ওর সঙ্গে করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কী করা যাবে ঠিক হয়নি।

সেদিন আবার এক অভিজাত পাড়ার মোড়ে সেই একই বকবক শুরু করেছিল পাগলটা। কি কারণে সেখানে তখন দাঁড়িয়েছিলেন একজন আমলা, যিনি কিনা শহরের নামজাদা শিল্পীও বটে। তিনি তাকে কষিয়ে থাপ্পড় মারেন। তারপর তিনি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে যান। কাজের ব্যস্ততায় ভুলেও যান কি ঘটেছিল। তারপর সপ্তাহান্তে ক্লাবে বসে আড্ডা দেওয়ার সময় তাঁর মনে পড়ল সেই কথা।

- আরে ভাই কি করব প্রথমে পাত্তা দিই নি, পাগলের প্রলাপ! তারপর বিরক্ত লাগল মনে হল আমাকেই বলছে মানে তাঁর নামে কিছু বলা মানে তো আমাদেরও বলা তাই না? মদের গেলাসে কায়দা করে চুমুক মেরে একটু থেমে বললেন, তারপর দুবার বারণ করলাম শুনল না। দিলাম এক চড়। বলেই তার মনে হল গল্পটা শুনে লোকজন খুব প্রসন্ন হয়নি, একটু রসভঙ্গ হয়েছে। তাড়াতাড়ি তিনি যোগ করলেন, মানে ননসেন্স কাজ একটা, পাগলের সঙ্গে যুক্তি চলে না, তাই আই লস্ট সেন্স অ্যান্ড কমিটেড ননসেন্স বলেই হেসে উঠলেন, বাচনভঙ্গিতে তাঁর পেশাদার চটকদারিত্ব ছিল যা পরিস্থিতি হাল্কা করে দিল।

পাগলটার অবশ্য এমন ননসেন্স হয়ে পড়ার যুক্তি ছিল না, কারণ পাগলের সেই সুযোগ নেই ইচ্ছে মতো ননসেন্স বলে নিজেকে ঘোষণা করার। ফলে সে রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রামে খিস্তি দিয়েই চলেছে নেতাকে। কেউ চটছে, কেউ বিরক্ত, সব চেয়ে খেপে উঠছে ওই রাস্তার ধারে যার জটলা করে। তারা নেতাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, পুজোর প্রসাদ চড়ায় তার নামে, যেমন ফুটবল দলের জন্যও চড়ায়, ভোটের সময় প্রচারের সামনে থাকে তারা, নেতার সভায় সবচেয়ে পিছনে। পাগলটাকে নিয়ে বিপদ, তাকে পাত্তা না দিলে কিছু নয় কিন্তু নেতার কানে গেলে, তিনি ভাববেন ওরা সব জেনেও কিছু করল না, না কি ইচ্ছে করে...ছিছি এমন ভাবাও পাপ।

একদল উৎসাহী ছোকরা সেদিন পাগলকে দেখতে পেয়েই ধাওয়া করল। পাগলদের এসব বোধ ভাল, অবস্থা সুবিধের নয় ওরা বুঝতে পারে, ফলে দে ছুট। কিন্তু ছুটতে ছুটতেও সে গালাগাল দিয়ে চলেছে। এ পাড়ার ছেলেরা থেমে গেল, হাঁপিয়ে গেছে, পাগল ভাবল বেঁচে গেছে, তখনই ওই কলোনির মধ্যে থেকে আরেক দল ছেলে তাড়া করল তাকে। সেদিন কী যেন এক ঘটে গেছে, যেমন দেশ বিশ্বকাপ জিতলে একেকটা দল আত্মহারা হয়ে রাস্তায় নামে ঠিক তেমনি। কিন্তু আজ পাগলটার পিছনে কেন নেমেছে কেউ বুঝতে পারল না। কলোনির ছেলেরাও তাকে ধরতে পারল না, পাগলটার চেঁচাতে চেঁচাতে মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে, দু'তিন বার পড়ে গিয়ে মাথার বাঁ পাশ, ডান হাঁটু ফুলে গেছে।

সে পালিয়ে এসে একটা বস্তিতে দাঁড়াতেই ওকে ঘিরে ধরল বস্তির ছেলেরা। আশ্চর্য ও পাগল হওয়ার পর শহরতলীর ওই বস্তিটাতেই আস্তানা গেড়েছিল। মানে একটা পরিত্যক্ত ঘুপচিতে কখনো সখনো থাকত, ওই বস্তির লোকেরা ওকে খাবার দিত মাঝেসাঝে, ও তাদের গানের আসরে নেচে-কুঁদে মনোরঞ্জনও করত, আর নিন্দুকেরা বলে রাত বেরাতে অসুখী মেয়েরা ওকে ঘরে টেনে নিয়ে যেত, কখনও নিজেদের তাগিদে তো কখনও বাঁজা নামের অপবাদ ঘোচানোর আশায়।

কোনো ভাবে পাগলটা হয়ত ভেবেছিল সে ওখানে নিরাপদ। কী ভেবেছিল কে আর বলতে পারে, পাগলের কাণ্ড। তো বস্তির ছেলেরা ঘিরে ধরল তাকে, শুরু হল চড় থাপ্পড় লাথি ঘুষি, কি আনন্দ মারতে মারতে, কি হুল্লোড়, নেশা লেগে গেছে, অমুকণ্ঠীর যে জলসা গত সপ্তাহে হয়ে গেল তাতেও এত উত্তেজনা ছিল না। পাগলটা খিস্তি মেরে চলেছে, গলার স্বর যত নামছে তত মার, যত থেঁৎলাচ্ছে মাথা তত ঘুষি, যত কাৎরাচ্ছে তত পেটে লাথি। এই শালা আমায় ছাড় এবার আমি, ধুর আমার ঘুষিটা ফসকেছে বউকেও ওত আস্তে মারিনি - নিজেদের মধ্যেও একচোট মারামারি লেগে গেল কে বেশি ভাগ পাবে। পাগলটা মাটিতে শুয়ে কাৎরাচ্ছে, ওদিকে মেয়েরা সোৎসাহে গালাচ্ছে

তাকে, এমনকি যারা ওকে টেনে নিয়ে যেত ঘরে তারাও, ভদ্রলোকেরা জড় হয়েছে, আমোদ দেখছে বেশ একঘন্টার রগড় চলল। প্রায় একটা ভাঙাচোরা চেয়ার বা বেড়াল চিবোনো মাছের মতো পড়ে রইল পাগলটা। মরেনি কিন্তু সে। কেন কে জানে! ওখানেই পড়েছিল সারা দিন সারা রাত, পরের দিন কলতলার পাশে।

পাগলটা দিন তিন চার পরে উঠল। বেঁকে হাটে কোনোরকমে, ল্যাংটো, মাথার চুল খাবলাখাবলা নেই। নিশ্চুপ সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটু বিব্রত হল শহরের সংবেদনশীল বলে পরিচিত যারা। আর স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলল অনেকে, কেউ আবার মজা শেষ ভেবে কিঞ্চিৎ দুঃখও পেলে।

তারপর হঠাৎ একদিন জানা গেল বেয়াদপটা কী করে বেড়াচ্ছে। সবার চোখ কপালে। আবার শুরু করেছে পাগলামি, এবার আরো ইতরের মতো। রাস্তার ধারে যত পতাকা ছিল নেতার দলের যত ফেস্টুন ব্যানার তাতে নিজের লিঙ্গ ঘষছে মনের আনন্দে আর বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ছে। শুধু নেতার নয় তাঁর বিরোধী যারা তাদের নিশানগুলোকেও সে বাদ দেয়নি। উ: কি ভয়ংকর। এবার আর নাগরিক সমাজ নয় এর ব্যবস্থা নিতে পারে একমাত্র কোতোয়াল, ফতোয়া দিল শহরবাসী। এই গ্যাংগ্রিন কেটে বাদ দাও শহর থেকে রব উঠল, আমাদের প্রিয় নেতা খুব ভাল তার ভালমানুষিকে দুর্বল ভেব না সে তুমি যেই হও।

এসব আলোচনা যখন চলছে পাগলটা আরো হিংস্র হয়ে উঠল। সে নখ দিয়ে ফালাফালা করে দিয়েছে সিনেমার পোস্টারে নায়িকার মুখ। আরো ভয়ংকর, সে একজন নামী ডিজাইনারের পোশাকের বিজ্ঞাপন চেটে দিয়েছে। কতক্ষণ ধরে তার লালা মাখা জিভ ঘষে ঘষে, তুলেছে সেই কাগজের জামার রঙ, নোংরা দুর্গন্ধ লালা আর শহরের সুন্দরী কলেজ-পড়ুয়া, বহুজাতিক চাকরি করা সুবেশ যুবকের চোখের সামনে একেবারে।

এইসব আটকানোর জটিল প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছে নানা কমিটি, সভা, এইসব রিপোর্ট দিচ্ছে জনমত তৈরি করছে। হঠাৎই একদিন শহরের মাঝখানে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। মরে গেছে, মানে পাগলকে কেউ কোনোদিন খুন করে না ধরেই নিতে হবে। দরকারটাই বা কী? কেউ ফিসফিসও করেনি এ সন্দেহের কথা, মনের মধ্যে যদি বা এসে থাকে, যেমন নিজের বোনের নগ্ন শরীর ভাবলে শিউরে ওঠে সবাই, সেভাবেই তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিল এ ভাবনা। নেতা আমাদের দীর্ঘজীবী হোন, আমাদের শহরটা সেরা শহর হয়ে উঠুক, আমার মাইনেটা বাড়ুক না একটু এসব ভাবতে ভাবতে দিন চলতে লাগল।

অদ্ভুত ব্যাপার নেতাও কেমন শুকিয়ে যেতে থাকল, বুড়িয়ে যেতে থাকল, কেমন তার সেই দাঁড়ানো, সেই হাত মুঠো করে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বক্তব্য রাখা আর ঠিক সুরে বাজছে না। লোকে বিরক্ত হতে শুরু করছে এবার, এ কেমনতর ব্যাপার। তাহলে কী পাগলটার অভিশাপ, না না পাগলের অভিশাপ আবার কী, নেতারই ভীমরতি। নতুন নেতার খোঁজ শুরু হয়ে গেল। পাগলটার কথা কেউ আর মুখেও আনে না শহরে। আর কেউ চায় না এমন দুর্বিপাক খামোখা আসুক। একটু সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই একে অন্যের দিকে আড়চোখে তাকাতে শুরু করল, আর থামল না সেই সন্দেহ। কেমন যেন থম মেরে গেল শহরটা।

(স্মরণ)

প্রবীর চট্টোপাধ্যায় / সেই তো আমার 'মা'

একটা বছর তিনেকের ছেলে, তার মায়ের হাত ধরে লাল সরানের ধুলো উড়িয়ে হাঁটছে। মা স্কুলের দিদিমণি। অতটুকু বাচ্চাকে ঘরে একা রেখে যেতে সাহস হয়নি, তাই সঙ্গে করে স্কুলের পথে। বড় পুকুরে পাড় ধরে ডোম পাড়ার মধ্যে দিয়ে লালমাটির রাস্তা ধরে যেতে যেতে দেখে - একটা বিশাল শুকর পুকুরের পাড়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। আর তার আট দশটি শিশু চকচক আওয়াজ তুলে তার দুধ খাচ্ছে। দিদিমণির ছেলে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ বাইনা ধরে বসল - মা আমি ওই দুদু খাব।

দিদিমণি হতবাক হয়ে প্রথমে মৃদু ধমক, তারপর হাসতে হাসতে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। ছেলে তখনো কেঁদে অনুযোগ করে চলে - আমি ওই দুদু খাব। ডোম পাড়ার মহিলারা কেউ কেউ শুনে, বলতে লাগলো - উ গুলা নোংরা, উদের দুদু খেতে লাই। খুকাবাবু তুমি মায়ের দুদু খাবে।

দাদর বাড়ির দোতলায় মায়ের ঘরে মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত আত্মীয়-স্বজনসহ সব ছেলে মেয়েরা সবাই। দিদিমণির পাঁচ ছেলে মেয়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামী মেজাজী স্বামী আর আকস্মিক নিদারুণ দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই কোরে সব ছেলেদের শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন একা হাতে। 'মা' - হার না মানা মনোভাব নিয়ে বড় ছেলেকে সর্বোচ্চ সম্মাননীয় উচ্চ আদালতের বিচারপতি, মেজ ছেলেকে ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ডে মেজাজী স্বামীর পদে পুনর্বহাল, ছোটকে শিল্পপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দিয়ে, পরিশ্রান্ত রণক্লান্ত সুখিনী মা আজ শান্তির চির নিদ্রায়।

মা ছিলেন অকল্পনীয় গুণের অধিকারিনী - সেলাই, ছবি আঁকা, নৃত্য, সঙ্গিতে বিশেষ দখল। যা বাস্তবের চাপে পূর্ণপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ পায়নি। তাঁর মধুর কণ্ঠের সঙ্গিত তাবড় তাবড় ওস্তাদকেও মোহিত করত।

সমস্ত আধুনিক চিকিৎসাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মহাপ্রস্থানের যাত্রা পথে যখন মা এক পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, বড় ছেলে সেই সময় দীর্ঘ পঁচিশ দিনের দিন-রাত লড়াইয়ের সঙ্গী ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করলেন - ডাক্তারবাবু, জবাব যখন দিয়েই দিলেন, মুখে জল দেয়ার আগে মায়ের প্রিয় সঙ্গীতের সুর তাঁর কানে দিতে চাই। শুনেছি আপনি ভাল গান করেন। একটা গান গাইবেন!

ডাক্তারবাবু একবার বিস্ময়ের চোখে বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে গান ধরলেন - 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে - দেখতে আমি পাইনি তোমায়...'

সবার চোখে জল নীরবে গড়িয়ে পড়তে লাগলো হাজারো স্মৃতির ধারায়।

কবিতার ক্রোড়পত্র

(৯০ এবং শুণ্য দশক - ঢাকা, বাংলাদেশ)

প্রবন্ধ : তপন বাগচী

সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণের দুই দশকের কবিতা

কবিসূচি

৯০ দশক

পরিতোষ হালদার, তপন বাগচী, মুর্শিদা আহমেদ, হেনরী স্বপন, সরকার আমিন, আয়শা ঝর্ণা, মুজীব মেহেদী, টোকন ঠাকুর, রহমান হেনরী, শামীম রেজা, মাহমুদ টোকন, শাখাওয়াত টিপু, রনজু রাইম, আলফ্রেড খোকন, বদরে মুনীর, ওবায়েদ আকাশ, জুনান নাশিত।

০০ দশক

মাজুল হাসান, তারিক টুকু, রঞ্জনা বিশ্বাস, আফরোজা সোমা, সজল সমুদ্র, নওশাদ জামীল, পিয়াস মজিদ, মৃদুল মাহবুব, অরবিন্দ চক্রবর্তী, মোস্তাফিজ কারিগর,জাহানারা পারভীন, প্রবর রিপন, শিমূল সালাহউদদীন।

এই সংখ্যায় কবিতার ক্রোড়পত্র কাঁটা তারের বেড়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সোজা বাংলাদেশের হৃদয় - রাজধানী ঢাকা। নব্বই এবং শুণ্য দশকের কবিদের কবিতা নিয়ে। নব্বই-এর কবি মাহমুদ টোকনের আন্তরিক উৎসাহ, এই প্রচেষ্টার নেপথ্য নায়ক। তিনি তাঁর মূল্যবান কাজের সময়, শারীরীক অসুস্থতাকে পাশে সরিয়ে রেখে এই যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। নেপথ্যে আরো একজন আছেন যার হাতে এই ক্রোড়পত্র আয়োজনের চাবিকাঠি, এই পত্রিকার অন্যতম সহযোগীহিতৈষী সোনালি বেগম। তার আগ্রহ ছাড়া এই চেষ্টা সম্পূর্ণ হতে পারত না। পরামর্শ ইত্যাদি জটিল বিষয়গুলির দায়িত্ব সাবলীল ভাবে সামলেছেন । ছোট পত্রিকার এই ধরণের কাজে সবসময় কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতার খুঁত থেকেই যায়। আমারাও তার বাইরে নই। -সম্পাদক।

৯০ দশক

পরিতোষ হালদার / একাকী খনিজ

ভুলে গেছি সব। কোন হাতে পাত্র রাখি কোন হাতে সোনার গোলক। ঘনকুয়াশার বনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেছে আমার সকাল। তিস্তা-বেগবতী-নিলাক্ষী কত শত নদীর নামে তোমারে ডাকতে গিয়ে প্রাণের শ্রাবণে কখন যে হয়ে গেছি জল। রূপালি শস্যের টানে সাঁই সাঁই উড়ে আসে পাখিদের ঝাঁক। ফড়িঙের ঘাস দেহে উদ্যানের প্রগাঢ় মমতা। কেবল ছায়ারা ডাকে, পার হয়ে যাই রোদের বেলা। অনেক গোপন ঘেটে যা কিছু তুলে আনি তার দেহে শ্যামল আঁধার। বুকের ওড়নায় রাত্রি ঘুমিয়ে থাকে, তারে তুমি জাগালে না - জাগালে না সংঘমিত্রা ধ্যানে। অজস্র ধোঁয়ার মতো জ্যোৎস্না নামে - সারারাত ঘুমাতে পারিনা, সারারাত চুরি হতে থাকে পাহাড়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ঘ্রাণ। নক্ষত্র তারার নীচে সাড়ে চারশ কোটি বছর পড়ে আছি একা। তোমারে হারাতে গিয়ে অবশেষে জেনে গেছি তুমিও একা আর ভালবাসা একাকী খনিজ।

তপন বাগচী / যাত্রাসংগীত

ক.

বেড়ালের পায়ে পায়ে রাত্রি এসেছিল
শীতঘুমে একটি জীবন যদি করা যেতে পারে!
পেচকের কান্না শুনে দুটি কান কত ভারী হবে?

বেড়ালের পায়ে পায়ে রাত্রি গাঢ় হয়
দূর থেকে ভেসে আসে তক্ষকের গান
হুহু করে ছুটে যায় ভেতর-বাউল

বেড়ালের পায়ে পায়ে রাত্রি চলে যায়
দুচোখে ঘুমের দাগ লেগে থাকে তবু
শুশুকের নাচ দেখে কাটাই সময়

খ.

পাহাড় শব্দের মানে কেবলই উত্থান
কেবলই আকাশ ছুঁতে প্রসারিত হাতের নাচন
সরিষার ক্ষেত থেকে যতদূর দৃষ্টি দিতে চাই
কেবলই হলুদরঙ
আমাকে বসিয়ে দেয় ধ্যানের পিঁড়িতে।

আধবোঁজা চোখে দেখি
পাহাড়ের খাদ বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে
অশরীরী ঝড়ের মাতন!
কোথায় যে নেমে যায়
আমি তার ঠিকানা জানি না...

আমর কেবলি ক্ষয়
ফোটা ফোটা অক্ষম সঞ্চয় নিয়ে বসে থাকি
পাহাড়ের কোল বেয়ে কোনদিন আসে যদি
ঝুটিবাঁধা একটি শালিখ!

হেনরী স্বপন / শূন্যে উড়ে যাওয়ার দিকে

এভাবে হয় না। অপেক্ষার হল্কা লীন হয়ে
উত্তাপের অধিক সম্মুখে ছিলে;
দূরত্ব খুঁজতে ভুলে গেছো
পায়ের হাঁটায় কিছু-স্নেহশব্দ
আঁতকে উঠতো;

কতোটা নিকটে ভর হয়ে দাঁড়াবে দু'পায়ে?

সমান উচ্চতা রেখে -
জুড়ে দিয়েছিলে, পারাপার
শূন্যে উড়ে যাওয়ার দিকে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঝুলে থাকা।

মনে মনে যে আর্দ্রতা ভেবে - গোপন পথিকে;
নীরবতায় চলে গেছো।

ফেলে রাখা দেহভার জড়িয়ে উঠছে ফুলে;
এভাবে মাংসের উরুঅব্দি-ভিতরে প্রস্রাব রেখে
সমুদ্রের লোনায় যেমন ছেলে?
ভালো থাকা -
না-থাকার
চেয়ে...আরও উৎসের কাছাকাছি...

নষ্ট হলে বেশি - ফলের আড়তে গন্ধ খুঁজে আসবে মৌমাছি...

আলফ্রেড খোকন / জ্বর ও ঝড়

তাকে ডাকলাম - শুনল না
অন্য এক ডাকে দিল উত্তর:
ঘুমিয়ে পড়েছে ও
এই রাত হাত পেতে বলল:
ঘুমাও তুমিও

ঘুমের মুখের ওপর একটা ফড়িঙ
উড়ে উড়ে আমাকে জানাল
ঝড়
মুখের উপরে হাত কেঁপে উঠল
গায়ে তার অদ্ভুত জ্বর।

সরকার আমিন / ঘাসের সাথে আমার কী সম্পর্ক

ঘাসের সাথে আমার কী সম্পর্ক?
কাতর হয়ে কেন এতটা কাত হয়ে পড়ি ঘনসবুজ দেখলে?
কেন আকাশকে একলা কাঁদতে দেখলে নীরবে সাহায্যের হাত বাড়াই?
অসম্ভব ইয়োবা-নীলের সাথে আমার তবে কী অবৈধ সম্পর্ক?

কিছু প্রশ্ন বোকাদের ব্যস্ত রাখে। আমিও বোকার হদ্দ।

মেঘ দেখলেই কেন কই মাছ হই কে জানে!
রাতারাতি প্রেম হাতাহাতি করে সৌজন্য সংখ্যার মতো দেহ
ভাঁজ করে রাখি
অপেক্ষায় থাকি তার সাথে দেখা হবে গোপন কথাও হবে

যে মেঘখন্ডটি ভাসতে ভাসতে নেপালের দিকে চলে গেল
সে আর কখনো ফিরে আসবে না বঙ্গোপসাগরে
ব্যক্তিগত ইলিশ জলেই বাস করে!

আমি কপালের ফেরে কবি হয়েছি বলে মাছ থেকে জল হই
আমি একটু বেশিই স্নান করি
যেন ঝাঁক ছেড়ে আসা এক নিঃসঙ্গ কই।

টোকন ঠাকুর / পরিস্থিতি ২০১১

ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের জন্য আমি কী করতে পারি?

যদি ঘনজঙ্গলে যাই
বাঘিনীর খপ্পরে পড়ি (হায়)
বাঘিনী যদি আমাকে থাবায়, খায়
তখন, দুধ হয়ে পৌঁছুতে পারি
মা-বাঘিনীর স্তনের বোঁটায়

বন পর্যটকই একদিন মনোযোগ দেবে
পড়ে থাকা কঙ্কালে, আমার হাড়ে

ওই যে বাঘিনী আসছে
এইবার, যেকোনো মুহূর্তেই, ক্ষুধার্ত বাচ্চারা
জঙ্গলে কবিতা লিখতে আসা আমাকে
খেয়ে ফেলতে পারে...নে

রহমান হেনরী / রাত্রির রূপকথা, স্মৃতির ইতিহাস

মধ্যরাতে, দোলাদের ছাদে দেখি, হরিণ লাফিয়ে ওঠে চাঁদে।
তৃণে ও জেব্রায় ভালোবাসাবাসি, শেষ হলে, চারিদিকে ভোজনের ঘ্রাণ
যেমন ছড়িয়ে থাকে, হুটোপুটি খায় এসে নাকে;
তোমার প্রসঙ্গ আজ তেমন সঘন ভাসে, রাত্রির বাতাসে...

আজও তাই পত্র লিখি তোমার উদ্দেশে,
শব্দে, নৈঃশব্দে, আর অক্ষরে ও নিরক্ষর শাদা শূন্যতায়
গ্রীণকার্ড ছাড়া...

শামীম রেজা / যখন রাত্তির নাইমা আসে সুবর্ণনগরে

এমন পাগলা বয়স, ঘুমরাত্তিরে মাটির বাঁশিবুকে ঘুমাইতে পারি
না, পাপ স্পর্শ করে না চোখের পাতা - পানশালায় সাতাইশ বছর
পইড়া আছি, বেহায়া বাতাস পিছন ছাড়ে না - অনুভূতির রহস্য
আছড়ে পড়ে বুকে, দুঃখের দেয়ালে ধাক্কা মারে -; পৃথিবীর বুকে
ঘুটঘুটে আন্ধার নিয়া অনিচ্ছায় শুইয়া থাকি কত কত বছর;
চোখের লাই ভাঙে না - পুঁথির গয়না পরি সাঁঝবেলায়, শামুকের
ভিতর দীঘির ঢেউ গুণি; ইন্দ্রপাশা গ্রামের মেলায় পাশা
শিকারীদের সঙ্গে পাশা-পাশা খেলি, ঘুম আসে না; ধূলামাখা
চাকতির মতো শবরীর স্তন, সবই কলকব্জা মনে হয়, ছেউড়িয়ার
ঘাটে সিকি চাঁদ পইড়া থাকে দীঘল দৃষ্টির আড়ালে - এসব আমার
চোক্ষে ধরে না। ময়নামতির বৃক্ষ-ডালে মধুরাত্তিরে, জলপ্রণয়ী
পাখিসাঁতারও ভালো লাগে না; লাঙলের ঘষা খাওয়া রেখাহীন
হাত দেইখা - দেইখা মানুষ জন্ম ভুইলা যাই, আদি-আদিম-একই
ঘৃণা কামশ্বাস - কোথাও ভালোবাসা নাই। পদ্মা-সুরমা-কুশিয়ারা-
আগুনমুহা কত কত নদী নাম বুকে বাজে না, ঘুম আসে না;
একবার কমলদহে প্রিয়তমার শরীর দাহ হলে কমলারঙের আগুন
ছড়ায়েছিল পূর্ণতোয়ার জলে; আর আমি সেইদিন থেইকা সাঁতার
কাটছি আগুনজলের ভিতর, তাতেও মৃত্যু আসে না!
এমন পৃথিবীতে ঘুম আসে না - মৃত্যু আসে না।

আয়শা ঝর্না / আগুনমুখো পাখি

হাওয়া আর হাওয়ার সাথে নিঃস্তব্ধ নির্জনতা ভর করে থাকে এখানের
জনারণ্যে, তারা বিহ্বল, বাক্যহারা যেন আগুনমুখো পাখি। গনগনে
লাভা নিয়ে ফোটে তাদের আকাঙ্ক্ষা।

আকাঙ্ক্ষার পাথর থেকে প্রতিধ্বনিত হয় নানারকম স্বর। স্বরগুলো
নিজস্ব অবয়ব নিয়ে আলোড়ন আনে অন্ধ ভিক্ষুকের চোখে কিংবা
নাম না জানা হাটুরেদের মনে।

ওরা কৃপাপ্রার্থী। কৃপা করো, কৃপা করো চেঁচিয়ে চলে অবিরাম
যেন তৃষ্ণাতুর চাতক। তৃষ্ণাতুরা চাতকিনী বুক দীর্ণ করা সুরে
উর্দ্ধলোকে চায় আর মেঘ নামায় দূরপিয়াসী কাফেলার উপর।

মুজিব মেহদী / হৃদগভীরের শিলালেখ

গুহাচিত্রিদের মাঝে ছিলাম আমি একসময়
তীরের ফলায় গাঢ় রঙের যোগান দিতে জীবিত ছিলাম
চকমকি পাথরের গায়ে যে অগ্নির দ্যুতি
সূচাগ্র চূড়ায় তার মিশেছিল সৃজন-উল্লাস

কস্তুরী মৃগের নেশায় যতটা হেঁটেছি পথ
ন্যুনতাই এঁকেছি দেয়ালে তার গুহায় গুহায়
আর ঘোর এসে যখন জাপটে ধরে পঞ্চেন্দ্রিয়
এবং ষষ্ঠসমেত সৃজনবিন্দুকে
তখন নারীর অধিকার মার খায় দিকে দিকে
যে কারণে নারী আসে বেঁকেচুরে অসম্পূর্ণতায়
অথচ যায় না গ্রহণ করাও তাকে
প্রচুর গ্রহণ-অসমর্থ শুধু চি-চি
ফাঁকা কথার আধারে তত চিড়েও ভেজে না

কোথাও তখন দেখি উন্মাদনা নেই
কুসুম পালক নেই
রাতের নয়ন জুড়ে শ্রান্তঘুম দ্রুততর নামে

অতর্কিত এক অভীপ্সায় বেঁচে থাকা প্রলম্বিত হয়
তারই ছাপ মুদ্রিত গভীর গুহার দেশে
এতদিনে কতটা বা খুঁজে পেলে তার -
বেড়ে ওঠা গানের গভীর থেকে
স্বল্প আলপনাঘন অধীর যাপনের লীলায়িত রেখাবলি
সারে সারে পাথর মধুর করে মহীয়ান হয় -
আমার হৃদগভীরেও এর বেড়েছিল সহস্র শেকড়।

মাহমুদ টোকন / বিজ্ঞাপন আমাকে নিও না

ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে একটি ভাঙনের সন্ধ্যা এসে গেলো। জলদূরবীনে -
চোখে পড়লো, একটি অলকানন্দা ফুটে আছে, শর্পিল ভঙ্গিমা...
ক্রন্দনের বাস্প উড়ে মিশে গেল প্রতিটি বাড়িতে।
কংকাল শহরে আজ কাদের উৎসব?

আহ্বান, আনন্দসিম্ফনি। প্রস্থান, ভেঙে ফেলে আত্মরক্ষার ব্যূহসমুদয়,
প্রেম, উত্থানের দিন ... তথাপিও বেদনাযেধক। ভাঙন সন্ধ্যায় ঈশ্বর
গোপন ব্রহ্মাস্ত্রখানি দ্যায়।

অনুর্বর প্লাবনসন্ধ্যা এরকম আসেনি, কশ্মিন। বাসের বাস্পটুকু
লেগে আছে কুয়াশায় গণিকা সংলাপ
ভেতরে যা ভাঙচুর ভিখিরী আর্তহাঁক প্রবাহমান
লাভা না-কি রক্ত না-কি পরমাণু দাহ-উত্তাপ?

অরণ্য তোমার কাছে সমর্পিত, বৃক্ষ করো বাকলে বাকলে -
লেখা থাক ক্রন্দনের দাগ, পাতার শরীর
বৈশাখে যুদ্ধ করে ঝরে পড়ি আবার জীবন পাব বলে
ঘাসের ফরাসমাঠে শুয়ে থাকি অশ্মশহর উপকুলে।

তথাপি আকাশ দেখি উল্কাপতন। শতেক আলোকবর্ষে কয়েকটি তারা জ্বলে
কিছু তারা নেভে। বিজ্ঞাপন আমাকে নিও না
ক্রন্দন আমায় কিছু দেবে...

সাখাওয়াত টিপু / ডিমের কুসুম

বয়স বাড়িতে বাড়িতে কমিয়া আসিতেছে। এই বাড়িয়া যাওয়ার নাম কমা। অথবা এহেন কমিয়া যাওয়াই বাড়িয়া যাইতেছে। কমিতে কমিতে বাড়িবার দিকে ঢুকিয়া ঢুকিয়া যাইতেছে। কই যাইতেছে? কে জানিতেছে? আজ আমরা জানিতে জানিতে শূন্যের দিকে হাঁটা মারিলাম। দেখি তাহাতে আগে আগে না বসিলে শূন্য পিছাইয়া পড়িতেছে। এই পড়িবাকে কেহ কেহ বলিতেছে মায়া। ডানে বসিয়াছে শূন্য। বামে বামে ঘামিতেছি আমি। কে যেন নিচের দিকে টানিতেছে, আমিও শূন্যের ভিতর মহাশূন্য হইয়া উঠিতেছি। বিলকুল বিল কুলসুম। শূন্যের ভিতর জাগিয়াছে ডিমের কুসুম।

ওবায়েদ আকাশ / প্রশ্ন উত্থিত হচ্ছে

তোমার দিকে তেড়ে আসছে বুনো বিছুটির শ্বাস
যারা তোমার নিজের হৃৎপিন্ডের ভেতর পালানোর ব্যাপারটি
একপ্রকার নিশ্চিত করেছে, বলা যায়

এবার তুমি চাঁদের রন্ধনশালায় - তোমার প্রিয় হাঁসের স্নায়ু
কাঁঠালের ঘ্রাণ - নিশ্চিন্তে রান্না করে খেয়ে নিতে পারো

নির্ধারিত কলঙ্কের ওপর চড়িয়ে দিতে পারো
তোমার দুরন্ত নৌযান

জলের সঙ্গম থেকে মাছেদের প্রস্থান প্রশ্নে
সামুদ্রিক আইনের ভাষায় ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা চলছে
ষড়যন্ত্রের শেষে সুগন্ধি ফোয়ারার মুখ

ফোয়ারার প্রতিটি বুদ্বুদ থেকে প্রশ্ন উত্থিত হচ্ছে -
কে কেন পালাতে চায় - জীবনের তেমাথা, চৌরাস্তায় এসে

মুর্শিদা আহমেদ / রক্তাক্ত রঙ্গপত্তমের মাঠ

বাইরে উন্মত্ত পদ্মা
ভেতরে রক্তাক্ত রঙ্গপত্তমের মাঠ
আগ্রাসী ছোবলোদ্ধত বৈরী আবহাওয়া
ফুলে ফেঁপে উপকুল ভাসানো সমুদ্রবুক
ঘরের ভেতর নিরলস হাতুড়ী ছেনির কারুকার্যে ভাস্কর
আঘাতে আঘাতে পূর্ণতা পায় ভাস্কর্য

কারো চোখে আঘাতের জল
কারো বুক থেকে উৎসারিত আদরের চুম্বন

প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে পৃথিবী
পাথরের বুকে ভাস্কর্য খোঁজে প্রাণ
শুনতে কি পাও কি কথা বলে
মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা কোন গান?

বদরে মুনীর / এখন সব অলীক

এখন সব অলীক ছবি, এখন সব ছায়া,
অস্বীকার ধূলোর মতো চাদর দিয়ে ঢাকে,
প্রতিশ্রুতি প্রাঞ্জলতা, পৃথক কাঙ্ক্ষাকে -
বিচুম্বিত অঙ্গীকার এখন শুধু মায়া।

তোমার থাক সুবিবেচনা, তোমার থাক রীতি
যুক্তি থাক, নৈতিকতা মাখানো থাক ছুরি;
তোমাকে দিক সুস্থতার ফুল্ল ফুলঝুরি
মর্মভাঙা মর্মজ্ঞানে বোধের অপচিতি!

অনুশোচনা অন্ধকারে আহত পশু হ'য়ে
বনভূমিকে বন-ভূমিকা রাখতে বলে, আর
আমার সব বৃষ্টিগান, সমূহ চিৎকার
আকাশভাঙা আলিঙ্গনে আকাশে যায় ক্ষ'য়ে।

এখন সব অলীক শুধু সত্য ভাঙা কাঁচ
অলৌকিক আর্তনাদে স্তব্ধ সন্ন্যাস।

জুনান নাশিত / কথামানবী, চৌকশ

মার্বেলে একা
(মল্লিকা সেনগুপ্ত স্মরণে)

ভেতরে বোধের কুঞ্চন

শিরায় শিরায় রক্তের ঘা।

শিরোপা জোটেনি তার
তবু কাঁপেনি চোখের তারা
কেবল শব্দমায়া হাতে

পথ ভাঙে গেরুয়া চাঁদের রথ।

অদৃশ্যের কাল পাথরে
কেন যে জাগায় রক্তের ঋণ।
মেঘবর্ণালী রাতে
আয়ুর বিন্যাসে ডুবে যায়

থামে না মৃদুমন্দ ঘোর।

বিন্দু বিন্দু ভোর গড়ায়
চৌকস মার্বেলে
প্রতিশ্রুত ডাক
চোখে স্নায়ুতে...

রনজু রাইম / ক্ষমতা

সীমাবদ্ধ জলে সাঁতার কাটার সমস্যা অনেক
দেখাতে পারবে না তুমি সামর্থ্যের সবটুকু খেলা
লোকে অক্ষমতার দায় চাপাবে তোমার কাঁধে
অহেতুক গুঞ্জরণে...
ফলত তোমার ভেতর জন্মাবে কিছু বিশুদ্ধ অভিমান,
এসব দেখে হাততালি দেবে পরিহাসপ্রিয়
কিছু হুজুগে মানুষ -
কেননা এ যুগের পান্ডিত্য যে কেবলই মূর্খদের দখলে।
তোমাকে ওজন দেবে তারা বামনের খেলনা নিক্তিতে,
সমুদ্র সমুদ্র বলে হাঁক ছাড়লেও তোমাকে ডোবার
ঘোলাজলেই সারতে হবে স্নান
দেখবে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কিছু
অসহায় আর্তনাদ
আলো ছড়াবে বলে ঘুরে মরছ প্রায়ান্ধ জনপদে
বারুদ জ্বালাবার আগেই তা নিভিয়ে দেবে
অত্যুৎসাহী বৈরী বাতাস -
জানবে তোমার জন্য নেই কোনও নীল-ময়ূরের
পেখম খোলা আকাশ -
বামনালয়েই আজকাল তুমি বড় সামাজিক; অসহায়
ক্ষমতার চাবুকই তোমাকে অক্ষম করে তুলছে ক্রমশ...

শূন্য দশক

নওশাদ জামিল / কফি

রাতের কুয়াশারেণু সব কিছু গাঢ় করে গেছে। তারাগুলো নিথর, নীরব। খোলা মাঠ, লতাগুল্ম শিশিরকণায় ভরে আছে শুধু। দূর থেকে মনে হয়, কেউ তবে রয়েছে দাঁড়িয়ে। দু-হাতে জাদুর কাঠি, মুখে তার হাসির প্রলেপ।

কতদিন পর দেখা? ট্রেনের হুইসেল শুনে দূরে চলে গিয়েছিল। পিছনে লুকিয়েছিল মেঠোপথ, ঘাস, দূর্বাদল, অনাঘ্রাত হাসি।

অথচ অনেকদিন ধরে তুমি মৃত! তোমার ভিতরে যত ধূলা ছিল, বালি ছিল, সব হাহাকার। করিডোর আলো করে কেউ আর ফোটে না এখন। তুমি আছো একা, ঘরের জোনাকিগুলো কেবল বাজাতে চায়, প্রাণভরে শ্বাস নিতে চায়। তুমি একা, রুগ্ন জলপ্রপাত। খুপরি ভেবে ঘরময় ছেড়ে দাও আরশোলা, টিকটিকি। তখন প্রাঞ্জল হয় প্রেত, দুটি স্বাভাবিক প্রাণী।

তোমার গলার স্বর ভারি ও কোমল। ডাক দাও মিহি সুরে: কফি খাবে, এসো। তখন আমার মনে হয়, কেউ যেন ফিসফিস করে। অস্পষ্ট প্রতীকগুলো এলোমেলো করে দেয়। শৈশবের পথ, নদী, গাঙচিল, মায়ের হাতের পিঠা, সাজানো টেবিলজুড়ে বোনের বেদম হাসি। সব কিছু একাকার।

তুমি আজ একা, ঘরে সব আলো নিভানো এখন।

রঞ্জনা বিশ্বাস / চাই উল্কি আঁকা জলের উল্লাস

বার ইঞ্চি বাই বার ইঞ্চি ছবির ফ্রেমে
নিজেকে ধরে রাখতে পারিনা বলে
দুর্নামের অপবিদ্যেরা
ব্যবচ্ছেদ করে হৃদপিন্ড এবং ফুসফুস।
কাকে বোঝাব -
তোলা জলে আমার শরীর ভেজে না।
আমার উঠানে একটা নদী চাই।
কাকে বোঝাব -
অবৈধ অভিশাপে কিভাবে
আমার দ্বাপর এবং ত্রেতা গেছে
এবার আমি বুঝে নিতে চাই
কতটা ভালবাসার দামে
দেবত্ব ছেড়েছিল নরকদেবী নার্গাল।
অর্ফিয়াসের বাঁশি ঠিক
কতটা কেঁদেছিল প্রিয়ার জন্য
বুঝে নিতে চাই।
ভাতের হাঁড়ির পরিমিত জলে
আমার মন ডোবে না।
আমার চাই পাহাড় কেটে
জলদেবীর মহান হৃদয়।
আমার চাই উল্কি আঁকা
জলের উল্লাস।
কাকে বোঝাব
তোলা জলে আমার শরীর ভেজে না
আমার উঠানে একটা নদী চাই।

তারিক টুকু / নীল অশ্বারোহী

১.
গোধূলিতে মেঘরক্তে লক্ষ্য কবি উল্লম্ফন, হাড়মজ্জা ঠান্ডা হয়ে আসে।
বৃক্ষকাণ্ডকে লেহন করে আলো - যেনবা অশ্বের রক্তজিহ্বা।
অসহজ বায়ু বয়, দূরের আকাশে সচকিত নক্ষত্রবুকের দপদপ শব্দে বুঝি,
দেয়াল টপকে এইমাত্র নামল আততায়ী, গুলি হল।
ঝুমঝুমি একা পড়ে থাকলো, উন্মাদ রাস্তায় নেমে তির্যক বৃষ্টিতে ভিজে
চলতি কোনও গান গাইল, দূরে হারমোনিকার সুরে ভেসে আসলো আমার কৈশোর।

২.
চারিদিকে ঘুম নেমে আসে, দেহকাণ্ড সবুজাভ হয়।
আমি ক্ষুধার্ত সিংহের কেশরকে দমবন্ধ নক্ষত্রঝড় বলে ভুল করি।
গান ছেড়ে যারা উঠে গেছে, তাদের প্রত্যেকের ডানা খসে গেছে।
লাল সাইরেনে সড়কের পাশে দাঁড়ানো গাছগুলো রং বদলায় -
আমি রক্ত ভেবে ভয় পাই, এক অতিজীবিত দৃশ্যের ভয়ে
তাকে ফেলে দৌড়ে চলে আসি।

৩.
সফল অশ্বেরা আসে রাতে, শিকতে চায় মূকাভিনয়।
তাদের হা থেকে ফুলকি আর প্রেতচ্ছায়া ঝরে।
জ্যোৎস্নায় ভাসমান ধনুক ও নৌকার মাঝে জাগ্রত বেশ্যারা
চন্দ্রকলঙ্কের দিকে উড়ে যেতে চায়।

হা থেকে শুয়োর জন্মে
বামনের দীর্ঘ লাইন রাত্রিকেও ধ্বস্ত করে তোলে।

পিয়াস মজিদ / ক্রুশকুসুম

এই ফুল কুয়াশাক্রান্তি মাঠের প্রসূন।
যখন বেদনার ডোলগুলো ভরে ওঠে
রাগ-আনন্দীর বিচ্ছুরণে।
ভাঙাচোরা গান-অশেষে
ভেসে চলি আমি
ঝিরিঝিরি জলের প্রাপাত ।
সোনার শকুন ডালে বসে চূর্ণ করে
মালিনীর রূপচক্র !
অরণ্যসবুজ অভিশাপের রেখা
ছলকে ছলকে উপচায়
তোমার গাঢ়-ঘন নিদ্রায়।
সব বিভাবরী শুষে
তারপর স্ফুটমান আমি
দিগন্তেরও উর্ধ্বমুখী
তরঙ্গচ্ছায়।

আফরোজা সোমা / অন্ধঘড়ি

একটি অন্ধঘড়ি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে
ঘুরে ঘুরে ছড়াচ্ছে সঙ্গীত
সঙ্গীত শেষ হবার আগেই
দু'একটি দুষ্টু বালক তুলে নিচ্ছে সুর
সুর থেকে কেউ
ধরে আনছে আরব্য রজনীর পাখি
তুলে আনছে কেউ বোবা গায়কের চোখ।
অন্ধঘড়ি - চোখ ছিল না বলে
কোনো দিনও পড়া হয়নি হাতের তালু
তালুতে লিখে রাখা ভূত-ভবিষ্যত
দুষ্টু বালকেরা ভূত-ভবিষ্যত ভাবে না
ভাবে একটি নিজস্ব সুর হলো বেশ !
এখন থেকে কারো সঙ্গে ঝগড়া হলে
ঢিল ছুঁড়বে না আর বরং
একটি নিপুন গান পাঠিয়ে দেবে
তার আত্মা বরাবর...

হন্টন

কুড়িয়ে আনা পাথরের গা থেকে
আলাদা করি রোদের ছায়া
বিচ্ছিন্ন পাহাড়ে মায়া...

পাথরের ছায়াও পথ আগলে দাঁড়ায়
নূপুর থেকে খসে পড়া নাচের মুদ্রা
জড়াই পায়ে।

পা তুই কোথায় যাবি যা!

অপরাধ

পাথরের ছায়াও পথ আগলে দাঁড়ায়
নূপুর থেকে খসে পড়া নাচের মুদ্রা
জড়াই পায়ে।

এক চিলতে বারান্দার দোতলা বাড়ি
বাড়িতে আসা-যাওয়া দখিন হাওয়ার
আর আসত চড়ুই।
ছানাপোনাসহ চড়ুই মা শিকার করতেন কখনো কখনো।

বন্ধ দরজা, জানালা, ঘুলঘুলি
পাখিদের ছুটোছুটি আর্তচিৎকার
এখনো মনে আছে মায়ের নিষ্ঠুরতা।
শিশু সন্তানের পাতে মা তুলে দিতেন পাখিমাতার মাংস
যার সন্তানেরা তার জন্য অপেক্ষামান নিকটবর্তী গাছে
বাড়ির গ্রিলে বাসা চড়ুইয়ের কাছে তাই
ক্ষমা চাই আমার মায়ের অপরাধের।

সজল সমুদ্র / দেহদ্বন্দ্ববোধ

দেহে আছো কি - বা নাই, তবু মন
বাতাসের আকারে ইঙ্গিতে ভেসে যাই

আমার কিঞ্চিৎ পথ লুপ্ত - সরল; ভেসে যেতে যেতে
গোলাকার আকাশের তলে যৌথ আমারই
বক্র, একদিন নদীর নেপথ্যে বাঁকা হয়ে যাবো
মনে হবে কিচ্ছু হাঁটি নাই পথ
অথচ আমাদের পায়ের দাগ, আঙুলের আর্তি সকল
কেবলই হেমন্তে শীতের ধারণা নিয়ে
বহুদূর একা ও অজস্র পড়ে রবে, ধুলো...

অরবিন্দ চক্রবর্তী / সঙ্কোচ

মনে করি, তোমার বুকে ফুলে ওঠা মাংসপিন্ডের
নাম সাহস
জনৈক রহস্য উন্মোচনের জন্য
সাদা পৃষ্ঠার শুরুতে অনামিকা পাখির শিস

এবার যাত্রার শুরু
অথচ ওই সাহসেই আমার বুক কাঁপে
সমুদ্র গর্জনকে ভয় না পেলেও
মৃদু দুলে ওঠা সাহসকে
আরো বেশি ভয় পাই।
কারণ কোন একযাপনে
উঠে এসে... নামতে পারি না
কে যেন সরিয়ে নিয়েছে মই
এখন নক্ষত্রআকাশে সিঁড়ি গড়ার সময়
ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন কুড়োতে কুড়োতে
স্বর্গ নিকুচি করে বাতাসে যেতে চাই
রসের তড়াগ ফুটছে পাতালে
মাটিতে ঝরে আছে টসটসে জাম
এতটাই উপরে যে আর নামতে পারি না...

সেই থেকে, সৌন্দর্যে আমার যত সঙ্কোচ।

মৃদুল মাহবুব / রেডিও সিরিজ-১

হে রেডিও, আমার প্রাণের ভেতর হতে তাড়িয়ে এনেছো এই জেব্রা জবাই, আহত দৃশ্য - ভাঙা
তোমার করুণ স্বর তাই।

আর মধ্যরাতের অধৈর্য বাতাস বেয়ে সময়ের দিকে উঠে যাচ্ছে অস্থির শামুক; খোলসের গুরুভার,
জীবনের ‘ওজন, মাধুর্য, হাভাব, বেপথ এই রাতেই কী পার হয়ে যাবে আকাশের অদ্বিতীয়
নক্ষত্রখচিত জ্বলজ্বলে স্তর, প্রজ্ঞাবৃক্ষ। যে আমি দাঁড়িয়ে আছি পাথরপাত্রের ভেতর তা আজ ভরে
গেছে রক্তে, অক্ষত শরীর থেকে কিভাবে যে এত রক্ত বেরিয়ে আসছে - একাই উতরে গেলো
ত্বকের প্রেক্ষাগৃহের দরজা, গাঢ়রঙ, আড্ডা, মাতালের শিস, হাসি, বিষণ্ণ নিরীহ সুর, কামনা,
সংলাপ।

প্রশান্ত নদীর পাড়ে শুয়ে আছি । জল আজ ধীরে ধীরে আলোসুতোর মায়াবী পথ ধরে ওই
পাহাড়ের দিকে চোখের আড়ালে তার শীতল তন্তুর পোশাক ছেড়ে আমাকেও ডাক দিচ্ছে
বৃষ্টিশাবলের মতো পৃথিবীর দিকে ছুটে যেতে।

শিশুশামুক, অজানা ওই কীটরাজ্যে বরং তোমার সাথেই যাওয়া ভালো। লাখো জেব্রার পিঠের উপর
দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে নিজের প্রথম নাম ভুলে যেতে যেতে রক্তগন্ধ ছড়ানো আমার দেহ তুলে
দেব ক্ষুধার্ত সোনালি ঈগলের ঘরে।

মাজুল হাসান / আত্মাহুতি

পরমায়ুর গুপ্ত অহমের রক্ত চক্ষু হলো ধূপ-তামাটে
খসে পড়েছে সকল নূরানী ছদ্মবেশী বহর
নিষিদ্ধ গন্ধমের মত দেবত্বের অতি মানবিক
মুহূর্তগুলো। অসীম বিক্রমে জাত লেঠেলের
তাতে ঠিক ঠিক ঠুকে দিয়েছি নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের
সীলমোহর
অনাকাঙ্ক্ষিত বর্গিয়ানায় আমি কোন ভুল করিনি...

শিমূল সালাহ্উদ্দিন / নিরবতাড়িত

আর তার বসে থাকা ভূতের মতোন

ঘরে কেউ নাই। বারান্দায়, উঠানে, কলতলায়, পৈঠায়
বাগানে, শিমুল পলাশ জোড়ের তলে - নাহ, কেউ নাই

বড় তেতুইতলায় অন্ধকার,
ঝুপসি কদম চালতার সারি, যজ্ঞডুম্বুরের মাটিনোয়া ডালটারে বায়ে রেখে
অবিরল জোছনায় লুটোপুটি খাওয়া একফালি মাঠ -

হাহাকারের মতো বাতাস আর নির্জন ঠুকরে খায় - কাকে।

নিরবতার নাটাই থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সুতা
কাহিনী যেনো বা

এ পরিণতিই কী বাসা বেঁধে ছিলো এতোকাল বুকে।

আর সে, দেখছে,
অনুর বাড়ির পাশে - রেললাইন
তার পাশে মাঠ
মায়ার চোখের মতো এফোড় ওফোড় চিড়ে ফেলা শব
একবার সে দেখতে চায় নিজের মুখ - মৃত
চুমু খেতে চায় কপালে, বুকতিলে

আর নিজেই জড়িয়ে ধরে নিজেকে ঘুমিয়ে পড়বে
চরাচরে তখন বাতাস বাতাস
ছমছমে চাঁদ, আকাশ আকাশ
নিদারুণ জড়াজড়ি খেলা, নদীপাড়ে, কালকাসুন্দি আর শটিবনে

মোস্তাফিজ কারিগর / বাড়ি

তোমাদের সাথে হেঁটে আমি নিশ্চিত বাড়ি ফিরতে পারি
পথ চিনিয়ে চিনিয়ে তোমরা বাড়িকে আমার সামনে
রাখবে; হয়েছে সেই আলাপ

জেনে শুনেই তোমাদের সাথে বাড়ি ফিরবো না

একা একা যেতে গিয়ে পথ ভুলে যাব; এভাবে
আমার পথ ভুলে যেতে ভালো লাগে, আর
চেনা হয়ে যায় নতুন কিছু পথ

একদিন সবপথ দিয়ে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো

প্রবর রিপন / ভবঘুরের বাধ্যগত পুনর্জন্ম চাবিয়ে খেতে

সব কাঁটাতার সীমানা ভেঙে শিল্পের স্নিগ্ধ বাগানে
ঢুকে পড়ুক কয়েকজন দানব
ঢুকে ভেঙে চুরমার করে দিক বিয়ারে সাজানো টেবিল
খিস্তি খেউড়ে ভরে উঠুক আমাদের অল ইউরোপিয় ডিনার টেবিল
বন্যতায় আদিম মানুষের সভায় আগন্তুক উজবুক বেবুন
তাদের দেহের মূল্যের বিনিময়ে পাওয়া ব্যাঙ্ক লোনের রেফ্রিজারেটরে
মানুষের ঘামে ফলানো আপেল
যে কতিপয় অতিদানব সংরক্ষন করে রাখে
সেই কথা ভেবে আরো উজবু...

তপন বাগচী / সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণের দুই দশকের কবিতা

বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ছিল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পরে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের দশক। এই দশকে কবিতার বিবেচনায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান তাই জরুরী। শতাব্দীর প্রথম দশক ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের দশক। এই দশকের কবিতার প্রেক্ষাপটেও আছে সক্রিয় রাজনীতি। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর কিংবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণের দুই দশকের কবিতা বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ইতিহাসের অনিবার্য উপকরণ হয়ে উঠেছে।

চলমান এই কাব্যধারার উত্তরে রয়েছে চল্লিশ দশকের কবিতা। তিরিশি আধুনিকতার আলোচিত পাঁচ কবির মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ এই বাংলাদেশ ভূখণ্ডেরই কবি। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা কলকাতাবাসী হলেও তাঁদের কবিতায় বাংলাদেশ তিরোহিত হয়নি। একই সময়ের কবি হলেও জসীমউদ্দীন তিরিশি আধুনিকতাকে অঙ্গীকার করেননি। বাংলাদেশের কবিরা তিরিশি আধুনিকতাকে গ্রহণ করেন চল্লিশের দশকে। কবি আবুল হোসেনের হাত ধরে এই আধুনিকতার যাত্রারম্ভ। কিন্তু আবুল হোসেন বেড়ে উঠেছেন কলকাতার কাব্যধারার আলোকে। চল্লিশের দশকের মুসলিম কবিদের মধ্যে বাংলাদেশের আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর এবং কলকাতার গোলাম কুদ্দুস যথার্থই আধুনিক হয়ে উঠতে পেরেছেন। ফররুখ আহমদ, সুফিয়া কামাল, আনম বজলুর রশীদ প্রমুখ কবি কবিতার রবীন্দ্রানাসুরী ধারাই বহন করে চলেছেন। বাংলাদেশের কবিতা প্রকৃত অর্থেই আধুনিক হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ হয়ে ওঠেন পঞ্চাশের কাব্যান্দোলনের ফসল। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন বাংলাদেশের গোটা সাহিত্যজগতকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের কবিতা বিস্তৃতি লাভ করে ষাটের কবিদের হাতে। ষাটের প্রথম প্রজন্মের কবিদের মধ্যে রফিক আজাদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, আবু হাসান, শহীদ কাদরী, বেলাল চৌধুরী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আসাদ চৌধুরী, মাহবুব সাদিক, শামসুল ইসলাম আর শেষের প্রজন্মের মুহম্মদ নূরুল হুদা, রবিউল হুসাইন, অসীম সাহা, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, রুবী রহমান, সমুদ্র গুপ্ত প্রমুখ নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এঁরা পাকিস্তানি শাসনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। লিটলম্যাগাজিনের গোষ্ঠীবৃত্তে আবদ্ধ থেকেও এরা বাংলা কবিতায় নতুন জোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও যোদ্ধা হিসেবে এর দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের কবিতায় আন্দোলন-সংগ্রামের ছবি চিত্রিত হলেও শুদ্ধ কবিতা

রচনা কিংবা নিরীক্ষার পথে হেঁটে বাংলা কবিতার স্থায়ী রূপরেখা অঙ্কনে এঁদের ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্মই হচ্ছে সত্তরের কবিরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে এঁরা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন ধ্বংস ও নির্মান, জয় ও পরাজয়। কবিতার পরিকাঠামো নির্মানের পাশাপাশি এঁরা দেশগঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে অজস্র কবির জন্ম হয়। এই দশকের আবির্ভূত কবির সংখ্যা বেশি হলেও টিকে থাকা কবির সংখ্যা বেশি নয়। আবিদ আনোয়ার, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্, আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার, নাসির আহমেদ, কামাল চৌধুরী, মুহম্মদ সামাদ, রবীন্দ্র গোপ, ত্রিদিব দস্তিদার, ফারুক মাহমুদ, তুষার দাশ, জাহিদ হায়দার, আসলাম সানী, বিমল গুহ, মাহমুদ কামাল, নাসিমা সুলতানা, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ফরিদ আহমেদ দুলাল, আবু হাসান শাহরিয়ার, আসাদ মান্নান, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রমুখ কবি সত্তরের কবিতার জমিন তৈরি করেছেন। এঁরা যেমন যুদ্ধজয় প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি এঁদের সামনেই ঘটেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। ৭৫-এর পটপরিবর্তন, বিশ্বাসঘাতকতা, সামরিক শাসন, প্রহসনের নির্বাচন - এসবের মধ্য দিয়ে কেটেছে সত্তর দশকের শেষাংশ। এই সময়ের কবিতার বিষয় হিসেবে যেমন মুক্তিযুদ্ধ এসেছে, তেমনি এসেছে অস্থির সময়ের প্রতিচ্ছবি।

এক সেনাশাসককে হটিয়ে আশির দশকে আসে আরেক স্বৈরশাসক। গোটা দশক জুড়ে চলে আন্দোলন-সংগ্রাম। এই সময়ের কবিতায় তাই চড়াসুর। পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের কবিরাও এই সময়ে এসে রাজনৈতিক কবিতা লিখতে শুরু করনে। তাঁদের দক্ষ হাতের কবিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আশির নবীন কবিদের অনেকেই হয়ে উঠলেন স্লোগানধর্মী কবিতার জনক। লিটলম্যাগ আন্দোলন এই সময়ে দানা বাঁধলেও কাব্যচর্চার চেয়ে গোষ্ঠিবৃত্তিই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। খোন্দকার আশরাফ হোসেন, গোলাম কিবরিয়া পিনু, দুলাল সরকার, ফরিদ কবির, ফেরদৌস নাহার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, সাজ্জাদ শরিফ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, প্রদীপ মিত্র, আবু হেনা আবদুল আউয়াল, কুমার চক্রবর্তী, আমিনুর রহমান সুলতান, সাজজাদ আরেফিন, শিহাব শাহরিয়ার প্রমুখ কবি এই সময়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

শতাব্দীর শেষ দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা একটু স্থিত হওয়ার চেষ্টা করে। স্বৈরশাসক হঠানোর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক আপাত স্থিরতা কবিতাতেও প্রভাব বিস্তার করে। সত্তরের উত্তালতা ও আশির নিরীক্ষপ্রবণতার পরে নব্বইয়ের কবিতা যেন নিজের ভাষা নির্মাণের চেষ্টায় সফল হতে চায়। কিন্তু জয় গোস্বামী আর রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ - সত্তরের এই দুই কবির ব্যাপক প্রভাব পড়ে এই সময়ের তরুণদের মধ্যে। আশির শেষপাদে চর্চা শুরু করেও নব্বইয়ের সারিতে নাম লেখান অনেক কবি। এই সময়ের কবিরা বিশ্বরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও কবিতায় তুলে ধরেছেন। আবার উত্তরাধুনিক কবিতা-আন্দোলনেও সামিল হয়েছেন কেউ কেউ। কেউ চলেছেন প্রথাসিদ্ধ শুদ্ধ রীতিতে। নিরীক্ষার নামে অযথা সময় ক্ষেপন করে হারিয়ে যেতে বসেছেন কেউকেউ। ভুল বাক্যে ভুল ছন্দে লিখেও গোষ্ঠীবাজির জোরে নাম কিনতে চান কোনো কোনো কবি। বিংশ

শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলাদেশের কবিরা প্রযুক্তিবিশ্বের সুবিধা পেয়েও যেন আত্মমগ্ন। তবু এরই মধ্যে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন যে সকল কবি তাঁদের মধ্যে বায়তুল্লাহ কাদেরী, রণক মুহম্মদ রফিক, টোকন ঠাকুর, সরকার আমিন, সুমন সরদার, মুজিব ইরম, মতিন রায়হান, শোয়াইব জিবরান, হেনরী স্বপন, মাহমুদ টোকন, রহমান হেনরী, চঞ্চল আশরাফ, শামীম রেজা, মামুন মুস্তাফা, আলফ্রেড খোকন, মুজিব মেহদী, কবির হুমায়ুন, আহমেদ স্বপন মাহমুদ, জাফর আহমেদ রাশেদ, মাসুদুল হক, কামরুজ্জামান কামু, আয়শা ঝর্ণা, তুষার গায়েন, হাসানআল আদুল্লাহ, বদরে মুনীর, মিহির মুসাকী, মজনু শাহ, রোকসানা আফরীন, শামীম সিদ্দিকী, সৌমিত্র দেব প্রমুখ। নব্বইয়ের দশকে এঁদের হাতে বাংলা কবিতা এগিয়ে চলেছে। তবে পঞ্চাশের কিংবা ষাটের দশকের মতো তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা, তা এখনো গবেষণাসাপেক্ষ। বরং বলা যায়, নব্বইয়ের কবিতা পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কবিতারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। উত্তরাধুনিক কবিতা বলে একটি আন্দোলন দানা বাঁধার আগেই স্তিমিত হয়েছে। কেউ কেউ নিরীক্ষার নামে কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তুলে স্বাতন্ত্রের দাবি করলেও তা হালে পানি পায় নি। পূর্ণাঙ্গ চিত্রকল্প তৈরির চেয়ে খণ্ড খণ্ড চিত্র নির্মাণ করে কেউ কেউ আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন। কবিতায় চিৎকার চেঁচামেচিও করতে চেয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু মিছে আস্ফালন সকলই কালের ধুলায় হারিয়ে যায়। সত্য উচ্চারণই কেবল টিকে থাকে কবিতার অবয়বে। প্রথাবিরোধিতার কথা কেউ কেউ উচ্চারণ করলেও তারা শেষতক প্রথার কাছেই সমর্পিত হয়েছেন। দৈনিকে লিখব না বলে নিজের বাজার বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে দৈনিকের পৃষ্ঠায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় রত হয়েছেন কেউ কেউ। আদর্শ বদলানো-

কেও কেউ কেউ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে এই ধারার কবিরা ক্রমশ বিস্মৃত হচ্ছেন। আর যাঁরা প্রকৃতই আদর্শের কাছে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা ক্রমবিকশিত।

আবার দেখা যায়, নব্বইয়ের দশকে আত্মমগ্ন কয়েকজন কবি নিভৃতচারিতার ভেতর থেকে নতুন চরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। তাদের মধ্যে পরিতোষ হালদার, রিষিণ পরিমল, কুমার বিপ্লব, মুর্শিদা আহ্মেদ, মোস্তাক আহমাদ দীন, বীরেন মুখার্জী, খলিল মজিদ, জ্যাকি ইসলাম, সন্তোষ ঢালী, হাদিউল ইসলাম, পাবলো শাহি,পাঁশু প্রাপণ প্রমুখ। প্রচারের ক্ষেত্রে তেমন হাঁকডাক সৃষ্টি না করেও এঁরা কবিতায় যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

'আধুনিক কবি ও কবিতা' গ্রন্থে কবি-প্রাবন্ধিক হাসান হাফিজুর রহমান কিছু প্রবণতা সনাক্ত করেছিলেন। তাঁর কিছু প্রবণতা এই সময়ের কবিতার মধ্যেও রয়েছে বলে মনে করেছেন। এই সময়ের কবি মামুন মুস্তাফা। 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতা : নব্বইয়ের দশক' নামে এক প্রবন্ধে তিনি কিছু প্রবণতা তুলে ধরেছেন -

১.অনিবার্য বক্তব্য, অভিব্যক্তি ও আঙ্গিকের অভাব। ফলে কবিতাকে কৃত্রিম বলে মনে হয়।

২. পাঠকের সঙ্গে ন্যুনতম যোগাযোগ না থাকায় সাম্প্রতিক কাব্য স্বেচ্ছাচারিতায় আক্রান্ত হয়েছে।

৩. কবিতার পুরো কাঠামো প্রায়ই স্পষ্ট থাকে না কবির কাছে। শব্দ, উপমা ও বক্তব্য এলোমোলো

হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক কাব্যের বন্ধ্যা শরীরে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিলেও তা বিশ্বাসযোগ্য এবং দ্যোতনায় হয়ে উঠতে পারে না।

৪. কৃত্রিম ও নাটকীয়তা যতখানি রয়েছে, স্বাভাবিকতা ততখানি নেই। ৫. মৌলিক স্বভাব, ঐকান্তিক উপলব্ধি এবং একান্ত বোধজাত নিজস্বতার অভাব।

৬. এর ঐতিহ্য তাৎক্ষণিক সাম্প্রতিকতার, ধারাবাহিকতা নয়।

৭. সার্বজনীন হওয়ার যোগ্যতা সামগ্রিকভাবে কমে আসছে।

৮.এর নিজস্ব কোনো প্রবর্তনা নেই, ক্ষয়ক্লিষ্ট রোম্যান্টিক আত্মউন্মোচন ছাড়া।

৯. ত্রিশের কাব্যের দুরূহতা এবং সাম্প্রতিক কাব্যের দূরপরায়ণতা এক নয়। ত্রিশের কাব্যের আবেদন জটিল হলেও সম্প্রসারিত ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কাব্যের আবেদন গুটানো, উন্নাসিক ও শুটিবায়ুগ্রস্ত। অধিকাংশ লোকের স্বভাবের বিরোধী এবং সভ্যতার যে প্রধান গুণ কল্যাণস্বভাব, তা থেকে স্খলিত।

১০. অতীতের অবক্ষয়প্রীতির পুনরাবৃত্তি। বস্তুত উপমা, আঙ্গিক, বিষয়, বিশ্বাস, অনুভূতি, বক্তব্য, মূল্যবোধ বা প্রতিক্রিয়া; এই সব গভীর পর্যবেক্ষণে তেমন মৌলিক ও সাহসী উদ্ভাবন ঘটানো সম্ভব হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।

এই মন্তব্য মামুন মুস্তাফার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ উঠে এলেড় অনেকেই হয়তো এর সঙ্গে একমত হতে পারেন। কিছু কিছু দ্বিমত থাকার অবকাশ থাকলেও নব্বইরে কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন আলোয় মুখ তুললেন একঝাঁক তরুণ কবি। দুইটি ভিন্ন দশক, শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ হলেও কালের বিচারে তারা সন্নিহিত। তাই নব্বইয়ের দশকের কবিতার গতিপ্রকৃতির চেয়ে আলাদ কিছু চোখে পড়ে না। এই সময়ের প্রচারের সুযোগে অপেক্ষাকৃত কম লিখেও বেশি আলোচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন কেউ কেউ। নতুন নতুন কাগজের সাহিত্যপৃষ্ঠায় এঁরা সদর্পে বিচরণ করে চলেছেন। অগ্রজদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার মধ্য দিয়েও কেউ কেউ তৃপ্তি খোঁজেন। কবিতায় নতুন কোনো মাত্রা যোগ না হলেও এ সময়ের কবিতায় নতুন কিছু শব্দবন্ধের প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিধারণার প্রকাশের ফলে কেউ কেউ স্বতন্ত্র ঘরানার জন্ম দিতে পারেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিরা হচ্ছেন - জাহানারা পারভীন, পরাগ রিছিল, তুহিন তৌহিদ, পিয়াস মজিদ, অতনু তিয়াস, এমরান কবির, মাজুল হাসান, মানস সান্যাল, মামুন রশীদ, মাসুদ পথিক, মাসুদ হাসান, মাহমুদ সীমান্ত, মিঠুন রাকসাম, সিদ্ধার্থশংকর ধর, সোমেশ্বর অলি, সোহেল হাসান গালিব, স্বপন সৌমিত্র, মোহাম্মদ নূরুল হক, এমরান হাসান, কাজী নাসির মামুন, কাফি কামাল, রঞ্জনা বিশ্বাস, যুবক অনার্য, রবু শেঠ, রনি অধিকারী, রিসি দলাই, রুদ্র আরিফ, অদ্বিত্ব শাপলা, অনন্ত সুজন, অবনি অনার্য, আফরোজা সোমা, আবু তাহের সরফরাজ, আমজাদ সুজন, আসমা বীথি, এমরান শাবিহ মাহমুদ, শামীম নওরোজ, শামীম হোসেন, শুভাশিস সিনহা, মনোজ কুণ্ডু, সফেদ ফরাজী, সামন্ত সাবুল, সারফুদ্দিন আহমেদ, জাহিদ সোহাগ, জুননু রাইন, পলাশ দত্ত, জুয়েল মোস্তাফিজ, সজল আহমেদ, তালাশ তালুকদার, তারিক টুকু, তুষার কবির, বিপাশা মন্ডল প্রমুক। নতুন সহস্রাব্দের

প্রথম দশকের কতিার কিছু বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছেন কবি মুহম্মদ নূরুল হক। তাঁর ধারণায় এই সময়ের কবিতায় পাওয় যায়-

১. বিশ্বায়নের সুর

২. ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

৩. মিথ প্রীতি ও স্বাদেশিকতা

৪. ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে নিস্পৃহ ও স্বধর্মের প্রতি সনিষ্ঠ থাকা

৫. ছন্দের প্রতি যত্নশীল

৬. স্বতন্ত্রস্বর সৃষ্টির প্রতি যত্নশীল

৭. আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকে পরিহার করে সার্বজনীন বোধের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

৮. সমকালীন বিষয়কে চিরকালীন ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ করা

এই ধারণাটি গড়পরতা হলেও এই দশকের কবিদের জন্য তা মোটাদাগে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে চার নম্বর এই ধারণাটি স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত বলে মনে হয়। স্বধর্মের প্রতি সনিষ্ঠ ব্যক্তি ধর্মীয় চেতনার প্রতি নিস্পৃহ থাকার তো সুযোগ নেই। বিশ্বায়নের প্রভাবে এ দশকের কবিতা কিছুটা হলেও আন্দোলিত। দৈনিক পত্রিকা কিংবা সাহিত্যপত্রের চেয়ে ব্লগ এবং ফেসবুকে কবিতা প্রকাশের সুযোগ সহজতর হওয়ায় প্রচুর কবিতা লেখা হচ্ছে। কিন্তু মানের দিক থেকে তা কতটা পদবাচ্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। অজস্র কবিতার ভিড়ে ভালো কবিতাটি খুঁজে পেতে যেন কষ্ট হয় পাঠকের। তাই অনেক অর্জনও আঙুল তুলে দেখানো যায় না। তবু এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই কেশর উঁচিয়ে হেঁটে চলছেন এই সময়ের প্রকৃত কবিরা।

সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে এই দুই দশকের কবিরা তাঁদের সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে চলছেন। সময়ই বিচার করবে তাঁদের কৃতিত্বের সম্পদ।

কবিতার বই

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ : বৃহন্নলা জাগো (পত্রলেখা) - ৫০ টাকা

কুমারেশ চক্রবর্তী : তোমাকে লিখি এসো প্রেম (জিগীষা) - ৪০ টাকা

বিশাল ভদ্র : সপ্তমঋতু (কবিতাসীমান্ত) - ৫০ টাকা

মোনালিসা চট্টোপাধ্যায় : না ফেরার দেশে (কৃত্তিবাস) - ৬০ টাকা

মাহমুদ টোকন : আত্মপ্রকাশ (খান ব্রাদার্স, বাংলাবাজার) - ১৮০ টাকা